সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ

ভারত বিচিত্রা

মে ২০২৩

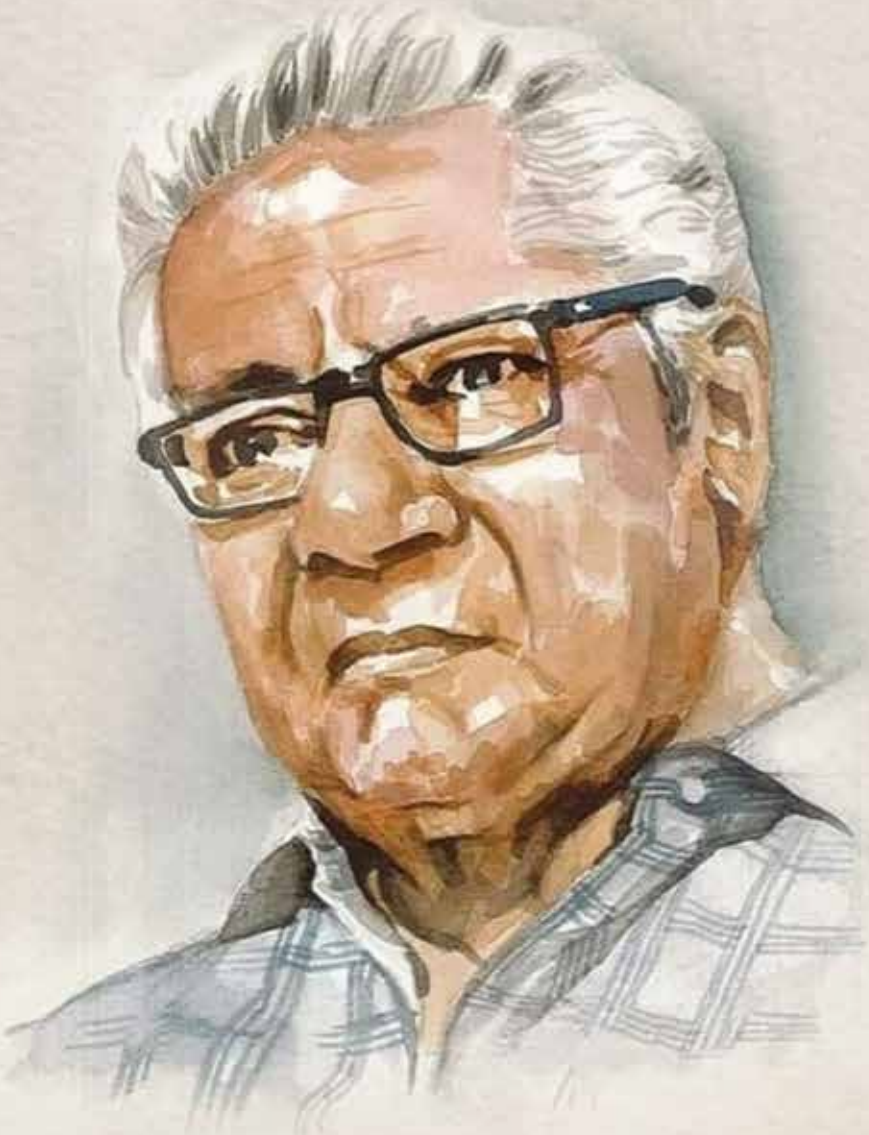

চিরনিদ্রায় সমরেশ

মাননীয় হাই কমিশনার প্রণয় ভার্মা ৩০ মে ২০২৩-এ ঢাকায় বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর) আয়োজিত একটি যৌথ বৈজ্ঞানিক সিম্পোজিয়ামে সম্মানিত অতিথি হিসেবে আমন্ত্রিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশের মাননীয় এস অ্যান্ড টি মন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান।।

ভারতীয় হাইকমিশন ২৮ মে ২০২৩ স্থানীয় সংস্থাসমূহকে সঙ্গে নিয়ে বাংলাদেশের চট্টগ্রামের পতেঙ্গা সমুদ্র সৈকতে 'জি২০ মেগা বিচ ক্লিন আপ' শীর্ষক একটি সমুদ্র সৈকত সাফাই কার্যক্রমের আয়োজন করে। মাননীয় হাইকমিশনার শ্রী প্রণয় ভার্মা এ আয়োজনে বক্তব্য প্রদান করেন।

মাননীয় হাই কমিশনার শ্রী প্রণয় ভার্মা ও বাংলাদেশের সড়ক পরিবহন মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের ২৪ মে ২০২৩-এ অনুষ্ঠিত একটি ভার্চুয়াল ইভেন্টের মাধ্যমে 'বারৈয়ারহাট-হেঁকো-রামগড় সড়ক প্রকল্পের প্রশস্তকরণ' গ্রাউন্ড ব্রেকিং অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

২৩ মে ২০২৩-এ মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এমসিসিআই) তাদের সদস্যগণের সঙ্গে একটি পারস্পরিক মতবিনিময় অধিবেশনের প্রধান অতিথি হিসেবে মাননীয় হাই কমিশনার প্রণয় ভার্মা উপস্থিত ছিলেন। এমসিসিআই-এর সভাপতি জনাব মোঃ সাইফুল ইসলামও এই অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করেন।

ভারত-বাংলাদেশ রেলওয়ে সহযোগিতার একটি বড় মাইলফলক হিসেবে, দর্শনা-গেদে ইন্টারচেঞ্জ পয়েন্টে ২০টি ব্রডগেজ লোকোমোটিভ হস্তান্তর করা হয়েছে ২৩ মে ২০২৩। ভারতের মাননীয় রেলমন্ত্রী শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব ভার্চুয়ালি এর উদ্বোধন করেন। বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের মাননীয় রেলমন্ত্রী মোঃ নুরুল ইসলাম সুজন লোকোগুলো গ্রহণ করেন। মাননীয় হাই কমিশনার প্রণয় ভার্মাও ঢাকার রেল ভবন থেকে এই ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানে যোগ দেন।

মাননীয় হাই কমিশনার প্রণয় ভার্মা ২১ মে ২০২৩-এ ঢাকার ভারতীয় সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে 'খাদ্য নিরাপত্তা ও মিলেট-এর গুরুত্ব' শীর্ষক একটি প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশের মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার।

সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ

ভারত বিচিত্রা

বর্ষ ৫১ | সংখ্যা ০৫ | বৈশাখ–জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯-৩০ | মে ২০২৩

High Commission of India, Dhaka
www.hcidhaka.gov.in; /IndiaInBangladesh
@ihcdhaka; /hcidhaka; /HCIDhaka

Bharat Bichitra
/BharatBichitra

অরবিন্দ চক্রবর্তী
সম্পাদক
ফোন : ৫৫০৬৭৩০১-৮, ৫৫০৬৭৬৪৫-৯ এক্স : ১১৪২
e-mail : inf2.dhaka@mea.gov.in

প্রকাশক ও মুদ্রাকর
ভারতীয় হাই কমিশন
প্লট ১-৩, পার্ক রোড, বারিধারা, ঢাকা-১২১২

প্রচ্ছদ শিল্পী অপু শীলের আঁকা পোর্ট্রেট অবলম্বনে
গ্রাফিকস শ্রী বিবেকানন্দ মৃধা
মুদ্রণ ডট নেট লিমিটেড ৫১-৫১/এ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০

ভারতীয় জনগণের শুভেচ্ছাসহ বিনামূল্যে বিতরিত
ভারত বিচিত্রায় প্রকাশিত সব রচনার মতামত
লেখকের নিজস্ব। এর সঙ্গে ভারত সরকারের কোনো যোগ নেই।
এ পত্রিকার কোনো অংশের পুনর্মুদ্রণের ক্ষেত্রে ঋণস্বীকার বাঞ্ছনীয়।

কেন্দ্রবিন্দু
পাঞ্জাব

পাঞ্জাব ধর্মীয়-সংস্কৃতির বৈচিত্র্যয় এক গৌরবময় রাজ্য। নিজস্ব সমৃদ্ধি আর সৃজনশীল মানুষের এক অপূর্ব সমাহার। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যতা যেমন আপনাকে মুগ্ধ করে স্নায়ুবৃত্তির মন্থরতা জয় করবে, তেমনি ইতিহাসসমৃদ্ধ করবে আপনার জ্ঞান রাজ্যকে, তাঁদের উষ্ণ অভ্যর্থনার সাথে রন্ধনশিল্পের অপূর্ব স্বাদ নিঃসন্দেহে মোহিত করে...

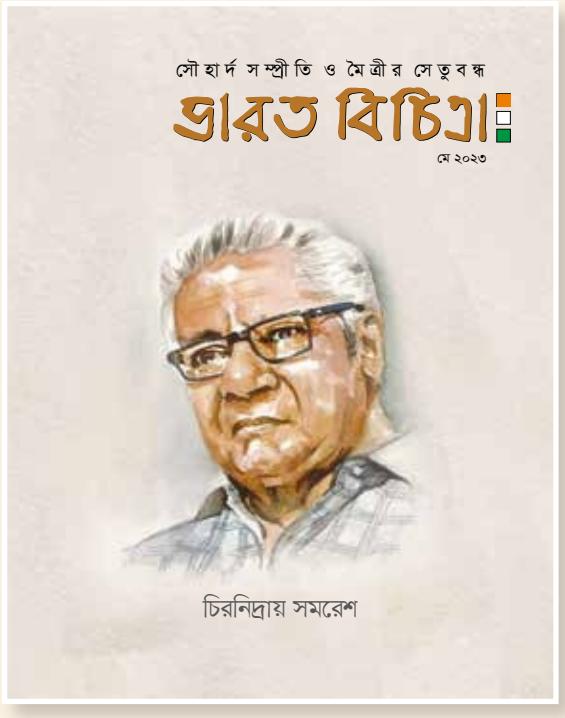

সূচি

প্রবন্ধ	রবীন্দ্রসঙ্গীতে হেমন্তরাগ ॥ বিশ্বদেব মুখোপাধ্যায় ০৪ মানবতার সংকট ও রবীন্দ্রনাথ ॥ ভীষ্মদেব চৌধুরী ০৭ কাজী নজরুল ইসলাম নতুন নন্দনের নকিব ॥ কুদরত-ই-হুদা ১০
চলচ্চিত্র	সত্যজিৎ রায়ের চলচ্চিত্র দর্শন ॥ নাজিমুদ্দীন শ্যামল ১৩
জন্মশতবর্ষ	মৃণালের মৃগয়া শালবৃক্ষের শাখা ॥ বিধান রিবেরু ১৮
মলায়লম ছোটগল্প	অন্য গ্রীষ্ম ॥ ই সন্তোষ কুমার ॥ অনুবাদ : তৃষ্ণা বসাক ২১
পঙ্‌ক্তিমালা	রঞ্জিত সিংহ ॥ সুব্রত সরকার ॥ আসাদ মান্নান ॥ মুস্তাফিজ শফি কচি রেজা ॥ নীলাঞ্জন বিদ্যুৎ ॥ রবু শেঠ ॥ আনিফ রুবেদ প্রাণজি বসাক ॥ শিলাদিত্য হালদার ॥ নিমাই জানা ॥ তালাশ তালুকদার সেলিম মণ্ডল ॥ অর্ণব বসু ॥ সারোক শিকদার ॥ দিপংকর মারডুক ২৪-২৬
অনূদিত কবিতা	কুট্টি রেবতীর কবিতা ॥ অনুবাদ : দিলারা রিঙকি ২৭
প্রয়াণ	সমরেশ মজুমদার সম্মোহনী ভাষার কথক ॥ গৌতম গুহ রায় ২৯
ধারাবাহিক উপন্যাস	বকেয়া হিসেব ॥ শ্রীপর্ণা বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৩
ছোটগল্প	ভিখিরি সমিতির সদস্যরা ॥ সায়ন্তনী ভট্টাচার্য ৩৬
কেন্দ্রবিন্দু	পাঞ্জাব ॥ শান্ত জাবালি ৩৮
অর্থনীতি	জ্বালানি তেলে ভারত এখন রোলমডেল ॥ মামুন রশীদ ৪২
ফিচার	ভারতের পনেরোটি উৎসব ॥ এনাম রাজু ৪৪
শেষ পাতা	চিত্রাঙ্গদা দুঃসাহসিক ইচ্ছেপূরণের ছবি ॥ তাপস কুমার দত্ত ৪৮

মুক্তিযুদ্ধ গ্যালারি উদ্বোধন

হাই কমিশনার প্রণয় ভার্মা ও বাংলাদেশের মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খাঁন কামাল ৩০ মে ২০২৩-এ ঢাকার ভারতীয় সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে একটি নতুন মুক্তিযুদ্ধ গ্যালারি উদ্বোধন করেন।

গ্যালারিটি ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে স্থায়ী বন্ধুত্বের সাক্ষ্য বহন করে এবং এটি দর্শনার্থীদেরকে এই দুই দেশের ইতিহাসের একটি তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায় দেখার সুযোগ করে দেয়। এটি বাংলাদেশের জনগণের বীরত্ব, সহনশীলতা ও অদম্য উৎসাহের প্রতীক হিসেবে কাজ করে।

হাই কমিশনার প্রণয় ভার্মা নতুন গ্যালারির উদ্বোধনকালে তাঁর বক্তব্যে, বাংলাদেশ ও ভারত উভয়ের জন্যই ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক তাৎপর্যের ওপর জোর দেন এবং বন্ধুত্ব ও সংহতির অটুট চেতনার ওপর গুরুত্বারোপ করেন যা বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য ভারতের সমর্থনকে নির্দেশ করে। তিনি বলেন, গ্যালারিটি ১৯৭১ সালের চেতনাকে রক্ষা ও উদ্‌যাপন করতে ভারত ও বাংলাদেশের যৌথ অঙ্গীকারকে তুলে ধরবে যা আমাদের সম্পর্ককে অব্যাহত রাখতে পথপ্রদর্শকের কাজ করবে।

এই অনুষ্ঠানটিতে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের প্রতিনিধিসহ বেশ কয়েকজন বীর মুক্তিযোদ্ধা, ইতিহাসবিদ ও বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সম্পাদকীয়

নন্দিত লেখক সমরেশ মজুমদার (১০ মার্চ ১৯৪২–৮ মে ২০২৩) আধুনিক বাংলা সাহিত্যে একটি সুবর্ণ সংযোজন। তিনি বাঙালির জীবনবোধকে সুসংহত করে কথাসাহিত্যকে করেছেন পাঠকসঞ্চারী। ইতিহাস চেতনার পাশাপাশি সমাজ ও জীবন বাস্তবতার অনন্য মিশেলে বাংলা সাহিত্যকে উপহার দিয়েছেন অসংখ্য সাহিত্যসৃষ্টি। তাঁর প্রকাশচিন্তন মৌলিক, মনোজাগতিক, রোমাঞ্চকর, অনুসন্ধানী এবং গভীর। তাঁর ভাষাশৈলী সরল হলেও আখ্যাননির্মাণ, দৃষ্টিভঙ্গি ও অন্তর্বীক্ষণে রয়েছে বহুমুখী বৈচিত্র্য। অভিজ্ঞতা, স্মৃতি, চেতন-অবচেতন সার্থকভাবে ধরা দিয়েছে তাঁর লেখনীতে। রাজনীতিক না হয়েও সময়ের রাজনীতি হয়ে উঠেছে তাঁর লেখার বিষয়আশয়। তিনি অবলোকন করেছেন সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা এবং ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়া মানবসভ্যতার করুণ কাহিনি। তাঁর গল্প বুদ্ধি বিবেক মানবিক ও দর্শনঋদ্ধ, কিন্তু নৈর্ব্যক্তিক; বাস্তব এবং অতিবাস্তব, সমকালীন ও কালোত্তর। বলা যায়, সাহিত্যবোধ বিরাটত্ব ও ব্যক্তি মানবতার পরিচয় তুলে ধরার জন্যই সমরেশের কলম ধরা। মধ্যবিত্ত সমাজে জন্ম নিয়েও নিজের শ্রেণিকে উপস্থাপনসহ নিম্নশ্রেণির মানুষের চরিত্রকে তিনি পাঠকের কাছে তুলে ধরেছেন।

সমরেশের আগে-পরে জনপ্রিয় অনেক কথাসাহিত্যিকের জন্ম হয়েছে। বোধ করি, বাংলা সাহিত্যে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রথম জনপ্রিয়ধারার সাহিত্যিক। তৎসমসাময়িক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়–এঁদের পরবর্তী সমরেশের উপন্যাস সবচেয়ে বেশি পাঠকপ্রিয়তা পেয়েছে। নব্বই দশক থেকে আজঅবধি সাহিত্যানুরাগী প্রত্যেকেরই কোনো না কোনোভাবে সমরেশ পাঠ রয়েছে এবং তা পাঠকের মননকে আলোড়িত করেছে। এমনকি অনুরাগী পাঠকদের অনেকেই সমরেশ-সৃষ্ট চরিত্রে নিজেকে খুঁজে পেয়েছেন। তিনি আসলে অসংখ্য পাঠককে আজীবন মুগ্ধতায় আচ্ছন্ন করার মতো জাদুকরি প্রতিভা নিয়েই জন্মেছিলেন। সমালোচকরা মনে করে মোহাবিষ্ট পাঠকগোষ্ঠী সমরেশ আবেশ থেকে বেরিয়ে আসতেই চেষ্টা করেন না, কিংবা পারেন না। একদিকে জনপ্রিয়তা অন্যদিকে কলাকৈবল্য। অপ্রিয় সত্য হলো এই, জনপ্রিয় ধারার লেখকদের কলাকৈবল্যবাদীদের তোপের মুখে চলতে হয়, সমরেশকেও তাদের দাঁত-খিঁচুনিতে পড়তে হয়েছে আজীবন।

পাঠকের রুচি ও চাহিদার কথা লেখক যদি মনে রাখেন তো ক্ষতি কী? সমরেশ দুই বাংলায় সমান প্রভাববিস্তারী লেখক না হলেও ভীষণ রকম জনপ্রিয় ছিলেন এবং এটা ক্রমশ বর্ধিত হচ্ছিল। অথচ, তাঁর রচনা শিল্পমানসমৃদ্ধ কি-না তা নিয়ে গঠনমূলক আলোচনা না করে ছিদ্রান্বেষীরা অস্বাস্থ্যকর তর্কে লিপ্ত থেকেছে। সমরেশ মজুমদার এসব গ্রাহ্যে নিয়েছেন বলে মনে হয় না, তাঁর নিবিষ্ট পাঠকমহলও কানে তোলেন না এসব অভিযোগ।

অনিমেষ নামক চরিত্রটিকে কেন্দ্র করে সমরেশ মজুমদার রচিত ত্রয়ী (উত্তরাধিকার, কালবেলা, কালপুরুষ) তাঁকে অনন্য উচ্চতায় পৌঁছে দেয়। তবে এটিকে ত্রয়ী বলা ভুল হবে। কেননা এই সিরিজের চতুর্থ খণ্ড রয়েছে। যার নাম 'মৌষলকাল'। তাই এই চারটি উপন্যাসকে একত্রে 'অনিমেষচতুষ্ক' বলাই শ্রেয়। এছাড়াও অসংখ্য নাটক, উপন্যাস, ছোটগল্প, ভ্রমণকাহিনি, গোয়েন্দাকাহিনি ও কিশোর উপন্যাসের স্রষ্টা সমরেশ মজুমদার। মানবজীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার রসায়ন প্রতিফলিত হয় তাঁর লেখনীতে। সমরেশ মজুমদারের উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলোর মধ্যে সাতকাহন, তেরো পার্বণ, স্বপ্নের বাজার, উজান গঙ্গা, ভিক্টোরিয়ার বাগান, আট কুঠুরি নয় দরজা, অনুরাগ ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

হালবছর রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপনের প্রস্তুতি চলছে, তখনই পাওয়া যায় এক অপ্রত্যাশিত দুঃসংবাদ–অগনিত পাঠকমনে মর্মন্তুদ হাহাকার ছড়িয়ে কথাশিল্পের রূপকার সমরেশ মজুমদার চিরকালের মতো চলে গেলেন এ পৃথিবী ছেড়ে। এ যাওয়া মাত্র শরীরী। রয়ে গেছে তাঁর অজস্র সৃষ্টি। নির্দ্বিধায় বলা যায়, সমরেশ মজুমদারের কাছে বাংলা ভাষাভাষীর রয়েছে অনেক ঋণ। সমরেশ কলকাতা, তথা বাংলার সর্বকালের অন্যতম সেরা লেখক হিসেবে পাঠকমনে আসীন হয়ে থাকবেন।

বাংলা চলচ্চিত্রে সবচেয়ে প্রভাব বিস্তার করে আছেন যে তিন চলচ্চিত্রকার তাদের মধ্যে অন্যতম মৃণাল সেন। তাঁর জন্ম ১৯২৩ সালের ১৪ মে, ফরিদপুরের ঝিলটুলি মহল্লার এক বৈদ্যব্রাহ্মণ পরিবারে। এককাতারে উচ্চারিত হওয়া সত্যজিৎ, ঋত্বিক, মৃণাল বাংলা চলচ্চিত্রের এই তিন পুরোধার মধ্যে সবচেয়ে বেশি সময় কর্মব্যাপ্ত ছিলেন মৃণাল সেন। শুধু বাংলায় নয়, হিন্দি, ওড়িয়া, তেলেগু ভাষায় চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছেন তিনি। তাঁর জন্মশতবার্ষিকীর উদ্‌যাপন ঘিরে ভারত-বাংলাদেশে হয়েছে নানান আয়োজন। ভারত বিচিত্রাও এই আয়োজনে শামিল হলো। মৃণালকে নিয়ে লিখলেন চলচ্চিত্র সমালোচক বিধান রিবেরু।

প্রতিবারের মতো এবারও নিয়মিত বিভাগ রইল। পাঠের আহ্বান।
সকলের মঙ্গল হোক।

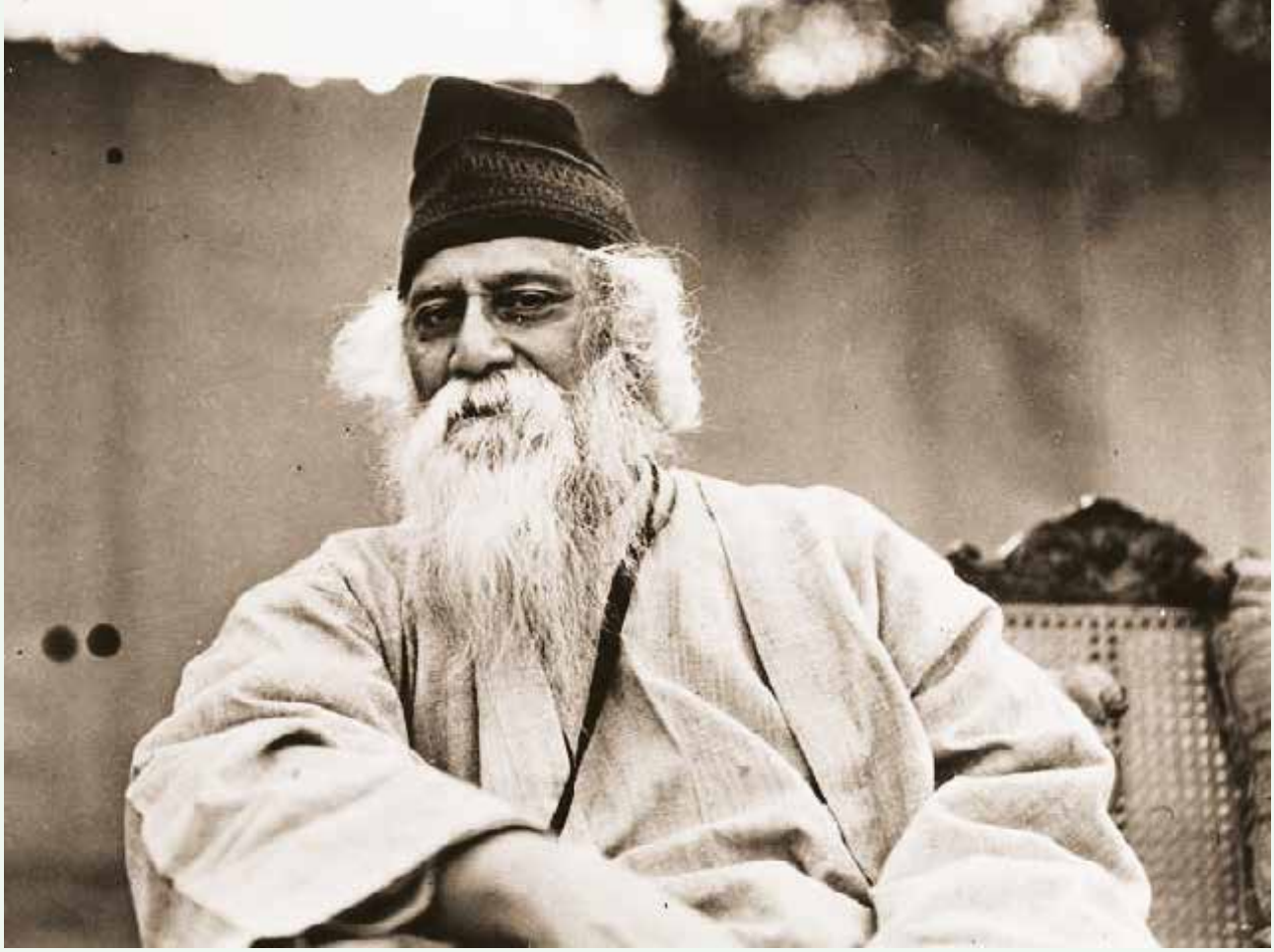

রবীন্দ্রসঙ্গীতে হেমন্তরাগ

বিশ্বদেব মুখোপাধ্যায়

প্রবন্ধ

প্রকৃতির দিকে তাকালে তার মুহুর্মুহু ভাবান্তর যে আমাদেরও হৃদয়ে আনন্দ-বিষাদের ছায়া ফেলে, তাই হলো ভাব। ভাব থেকেই সঙ্গীত আর তাই প্রকৃতির ভাষান্তরের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে সৃষ্টি হয়েছে নানা রাগ। ছ'টি ঋতুর সঙ্গে সাজুয্য রেখে ছটি রাগ। গ্রীষ্মে দীপক, বর্ষায় মেঘ, শরতে ভৈরব, হেমন্তে মালকোশ ও শীতে শ্রী।

মতান্তর আছে; কিন্তু সেটা আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। আমাদের আলোচনার বিষয় রবীন্দ্রসঙ্গীতে হেমন্ত ঋতু। সুতরাং এই যে ছয় রাগ, আমরা তার মধ্যে মালকোশ রাগটিকেই বেছে নেব; কারণ, শাস্ত্রমতে হেমন্ত ঋতুর ভাবের প্রকাশক।

কিন্তু, সেই সঙ্গে এটাও সমান ভাবেই প্রয়োজনীয়, যে রবীন্দ্রনাথের চোখে হেমন্ত ঋতুর যে রূপ, তার ভাব প্রকাশক রাগটির নাম কি?

আপাত শ্রবণে মনে হবে, এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া অসম্ভব; কিন্তু সেটা হয়তো ঠিক নাও হতে পারে। আসলে, বাস্তবিকই সেটা ভুল; কারণ পথ একটা আছে এবং সেটা আছে রাগের শাস্ত্রীয় বিধানের মধ্যে নয়, বরং রবীন্দ্রনাথের গানের বাণীর গভীরে। খুঁজতে হবে তাঁর গানের বাণীর মধ্যে।

কিন্তু কাজটা কঠিন হবে না, যেহেতু রবীন্দ্রনাথের ঋতু পর্যায়ের গানের সংখ্যা অনেক হলেও, হেমন্ত ঋতুর গান খুব বেশি নয়। পাঁচটি মাত্র কিন্তু সেটা বাণীর বিচারে; সুরের বিচারে মালকোশ রাগাশ্রিত যে কোনো গানকেই শাস্ত্র মতানুসারে হেমন্ত ঋতুর গান বলতে হয়

মালকোশ একটি অতি গভীর রাগ, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের খুব একটা প্রিয় রাগ ছিল বলে মনে হয় না। তাঁর গানের সংখ্যা দু'হাজার দুশো বা তার কাছাকাছি; কিন্তু মালকোশ, রাগাশ্রিত গানের সংখ্যা তার মধ্যে দুটি মাত্র। একটি গান বহু পরিচিত 'আনন্দধারা বহিছে ভুবনে' যার অবিস্মরণীয় একটি রেকর্ড আমরা শুনি কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠে, যার বিকল্প আজও হলো না। এই রেকর্ডটির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ আছে, যা বলা প্রয়োজন। কথাটা হলো এই যে, রবীন্দ্রনাথ এই গানটিতে যে সুরারোপ করেছিলেন, যা স্বরলিপিতে পাওয়া যায় (স্বরবিতান ৪৫ খণ্ড), তা মিশ্র মালকোশ বা সম্পূর্ণ মালকোশ বলা যায়, যদিও সম্পূর্ণ মালকোশের প্রকৃত রূপ কী, এ নিয়ে নানা মতবিরোধ রয়েছে যথারীতি। সম্পূর্ণ রাগ বলতে আমরা সেই সমস্ত রাগকেই বুঝি, যাতে স্বরগ্রামের সাতটি স্বরই ব্যবহৃত হয় (সা র গ ম প ধ ন)। সেই হিসেবে আমরা যাকে মালকোশ বলে জানি তা সম্পূর্ণ শ্রেণিভুক্ত নয়। এটি ভৈরবী ঠাটের অন্তর্গত একটি প্রধান রাগ, যাতে ভৈরবী থেকে রেখাব্ এবং পঞ্চম (রে ও পা) বর্জিত হয়েছে। কিন্তু সম্পূর্ণ মালকোশ রাগটির নামই বলে দেয় এটি রেখাব ও পঞ্চমযুক্ত। কিন্তু কোন রেখাব? পঞ্চমের অবশ্য প্রকারভেদ নেই। কিন্তু রেখাব শুদ্ধ না বিকৃত অর্থাৎ না কোমল– এ প্রশ্ন উঠতেই পারে। ভৈরবী ঠাটের প্রতিটি স্বরই কোমল, অতএব এক্ষেত্রেও রেখাব কোমল হওয়াই স্বাভাবিক, এটা ভাবলে ভুল হবে; কারণ সম্পূর্ণ মালকোশ একটি প্রাচীন রাগ এবং এটি যখন সৃষ্টি হয়েছিল' তখনো হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে পণ্ডিত ভাতখণ্ডে প্রবর্তিত ঠাট পদ্ধতি সুদূর ভবিষ্যতের গর্ভে। ফলত রাগটি যখন সৃষ্টি হয়েছিল, তখনো এটি কোন ঠাটের অন্তর্গত–এ প্রশ্ন ওঠেনি। ফলত আধুনিক ভাত খণ্ডীয় মতে বললে, এটি আশাবরী ঠাটের অন্তর্গত হওয়াও খুবই সম্ভব, কিন্তু সেটা নির্ভর করছে রেখাবটি আসলে শুদ্ধ না কোমল–তার ওপরে। রেখাব শুদ্ধ হলে আশাবরী ঠাটও হতে পারে।

যাই হোক সম্ভাবনা শুধু স্বরের ওপরই নির্ভর করে না। রাগের চলনও গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং মতভেদ রয়েছে। রাগের বাদী সম্বাদী স্বরের ওপরও রাগের চরিত্র নির্ভর করে এবং মতভেদ সেজন্যও হতে পারে। কিন্তু স্বরের পার্থক্যেই বিভিন্ন ঘটনার এই রাগের রূপ পৃথক হয়েছে, তার উদাহরণও কম নয়। যেমন আত্রৌলি ঘরনার কালজয়ী শিল্পী কেশর বাঈ কেরকরের গাওয়া যে সম্পূর্ণ মালকোশ তাতে স র জ্ঞ গ ম প দ ধ ন–এই ন'টি স্বর ব্যবহৃত হয়েছে। অথচ ওই একই ঘরানার আরেকজন অসামান্যা শিল্পী মগুবাঈ কুর্দিকর সম্পূর্ণ মালকোশ গেয়েছেন ভৈরবীর কোমল রেখাবের পরিবর্তে শুদ্ধ রেখাব ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ তার গাওয়া সম্পূর্ণ মালকোশ হলো আশাবরী ঠাটে অন্তর্গত। আবার ইমদাদ্‌খানী ঘরানার সেতারী ওস্তাদ সুজাত খাঁ (ওস্তাদ বেলায়েত খাঁর পুত্র) সম্পূর্ণ মালকোশ রাগে আরোহনে মালকোশের মতোই ভৈরবীর রে পা বর্জন করেছেন কিন্তু অবরোহণে আশাবরীর মতো শুদ্ধ রে ও পা যোগ করছেন।

সুতরাং শাস্ত্রমতে সম্পূর্ণ মালকোশ রাগটির রূপ আসলে ঠিক কেমন, নির্দ্বিধায় তার উত্তর দেওয়া কঠিন। তবে রবীন্দ্রনাথের 'আনন্দধারা বহিছে ভুবনে' গানটির যে আদি সুর, সেটা এসব ছাঁচের কোনোটাতেই পড়ে না। স্বরবিতান ৪৫ খণ্ডে রবীন্দ্রনাথের দেওয়া সুরটির যে স্বরলিপি পাচ্ছি তা এইরকম,

।। সা সা- ণ্ ঋ। সর্ণ্া- সর্ণা দ্া-র্ণা। সা সা সমা জ্ঞা। মা ক্ষ মা জ্ঞা। আ ন ন্ দ ধা ০ ০ রা ০ ব হি ছে ভু ব নে আ ০

ইত্যাদি অর্থাৎ এই সুরে ঋ এবং ক্ষ অর্থাৎ কোমল রেখাব। বরং তীব্র মধ্যম– স্বর দুটি ব্যবহৃত হয়েছে, মালকোশে বর্জিত, কিন্তু পঞ্চম অর্থাৎ পা স্বরটি ব্যবহার হয়নি একবারও (স্বরবিতান ৪৫ খণ্ড দেখুন) সমগ্র গানটি পঞ্চম বর্জিত যদিও।

শুদ্ধ এবং তীব্র– দুটি মধ্যমই ব্যবহৃত হয়েছে। ফলত, এই সুরটিও সর্ম্পূন শ্রেণিভুক্ত নয়, সুতরাং সম্পূর্ণ মালকোশও ঠিক ঠিক সেই অর্থে নয়।

যাই হোক, গানটির আদি সুরটি এখন অপ্রচলিত এবং কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গাওয়া গানটির সুরকার কে জানা নেই, তাঁকে অজস্র শ্রদ্ধা, প্রণাম। এ সুর চিরকালের এবং শাস্ত্র মতে, হেমন্ত কালের, রাত্রির। গানের বাণীও সেই কথাই বলে। গানটির বাণী যে শান্তভাবের প্রকাশক, তা হেমন্ত হতে পারে, শরৎ, বসন্ত বা গ্রীষ্মেরও সম্ভব।

অতএব, এ প্রসঙ্গে স্বাভাবিক সিদ্ধান্ত হতে পারে, এই যে, রবীন্দ্রনাথ যদিও গানটি হেমন্ত ঋতুর গান হিসেবে চিহ্নিত করেননি, কিন্তু কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গাওয়া গানটি যেহেতু বিশুদ্ধ মালকোশে আধারিত এবং শাস্ত্রে যেহেতু মালকোশ রাগটিকে হেমন্ত ঋতুর রাগ হিসাবেই চিহ্নিত, অতএব সে হিসাবে এই গানটিকে হৈমন্তিক রবীন্দ্রসঙ্গীত বলতে পারি।

কিন্তু রবীন্দ্রসঙ্গীত আরো একটি আছে, যা বিশুদ্ধ মালকোশে এবং এ সুর রবীন্দ্রনাথেরই। গানটি 'চিরকুমার সভা' নাটকের গান এবং অত্যন্ত লঘু রসাত্মক। গানটির বাণী উদ্ধৃত করছি।

'স্বর্গে তোমায় নিয়ে যাবে উড়িয়ে–
পিছে পিছে আমি চলব খুঁড়িয়ে,
ইচ্ছা হবে টিকির ডগা ধরে
বিষ্ণুদূতে মাথাটা দিই গুড়িয়ে।'

এগানটির বাণী কোনো ভাবেই হাসির উদ্রেক করে না। আসলে হাসির গান বলে কিছু হয় কিনা, তাতে আমার গভীর সন্দেহ আছে। আজ পর্যন্ত হাসির গান বলে পরিচিত যত গান শুনেছি, তার প্রায় সবগুলিই অত্যন্ত কৃত্রিম এবং জোর করে হাসানোর চেষ্টা বলে আমার মনে হয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে সমস্যাটা ছিল আরো বেশি, যেহেতু হাসির গানের সঙ্গে এমন কিছু মিশেই থাকে, যা প্রায়শই স্থূল অথবা আদি রসাত্মক, হয়তো-বা অশালীনও, রবীন্দ্র দৃষ্টিতে, অতএব এক রবীন্দ্রনাথের কোনো গানই তাঁর শুদ্ধতার অভ্যাস ছেড়ে বেরিয়ে আসতে পারেনি।

আমাদের সৌভাগ্য বলতে হবে যে, পারেনি। পারলে রবীন্দ্রনাথকেই যে নামতে হতো। তবু ভাবতে অবাক লাগে, মালকোশের মতো এত গভীর একটি রাগকে নিয়ে তিনি এমন একটা ছেলেখেলা কেন করলেন। অথচ মালকোশের স্পর্শে তাঁর গানও যে কত মহৎ হয়ে উঠতে পারে, তার প্রমাণ কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় গাওয়া 'আনন্দ ধারা বহিছে ভুবনে' গানটি, যার রেকর্ড হয়েছিল ১৯৫৬ সালে; কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ততদিনে ইহলোক ত্যাগ করেছেন।

প্রশ্ন হতে পারে এই বিশেষ রেকর্ডটির কথা কেন আবার ফিরে এলো। কারণ, আমরা ক্রমশ এমন প্রসঙ্গের গভীরে প্রবেশ করব, যেখানে রে পা বর্জিত রাগের একটা বিশেষ ভূমিকা আছে। কিন্তু তার আগে বলে নিই, রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি পর্যায়ের গানগুলির মধ্যে হেমন্ত ঋতুর পাঁচটি গান হলো, হিমের রাতে ওই গগনের দীপগুলিরে, হায় হেমন্তলক্ষ্মী, তোমার নয়ন কেন ঢাকা, হেমন্তে কোন বসন্তেরই বাণী, সে দিন আমায় বলেছিলে, এবং নমো নমো নমো তুমি ক্ষুধার্ত জনারণ্য। গানগুলি যথাক্রমে বেহাগ, কীর্তনের সুর, খাম্বাদ, বেহাগ এবং কাফি রাগাশ্রিত। এছাড়া এই পাঁচটি গান সম্পর্কে আপতত : শুধু এটুকুই বলার যে, এর মধ্যে হেমন্তঋতুর জন্য নির্ধারিত যে রাগটি, সেই মালকোশের চিহ্নমাত্র নেই।

কিন্তু আরো একটা কথাও এখানে বলার আছে আর তা হলো, শাস্ত্র মতে ছ'টি ঋতুর জন্য ছটি রাগের যে বিধান, সে বিষয়ে নানা মুনির নানা মত ছিল। প্রচলিত চারটি মতের মধ্যে ভরত ও হনুমন্ত্রের সঙ্গে হেমন্তের রাগ হলো যথাক্রমে, মালকোশ ও কৌশিক। যতদূর মনে হয় কৌশিক রাগটি আসলে ছিল মালকোশেরই নামান্তর। এছাড়া ব্রহ্মা ও কল্লিনাথের মতে হেমন্তের রাগ যথাক্রমে নট ও নটনারায়ণ। কিন্তু এদুটি রাগ এক নয় অধিকন্তু মালকোষের সঙ্গে এদের কোনো মিল নেই।

দুটি রাগই প্রাচীন হলেও, এখনো অবলুপ্ত হয়ে যায়নি, তবে কম শোনা যায়। নট রাগের একটি অনবদ্য রেকর্ড আছে, শিল্পী পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ ঠাকুর নটনারায়ণী রাগে দু'টি রেকর্ডের কথা মনে পড়ছে। একটি গেয়েছেন পণ্ডিত যশরাজ এবং অন্যটি বেহালার রেকর্ড বাজিয়েছেন বিদুষী কলা রামনাথ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁর হেমন্ত ঋতুর কোনো গানেই এ দুটি রাগের কোনোটিই ব্যবহার করেননি। তবে, নট রাগাশ্রয়ে প্রেম পর্যায়ের একটি গান আছে মন জানে মনমোহন আইল, এবং কালমৃগয়া নৃত্যনাট্যের একটি গান, 'শোক তাপ গেল দূরে' আর, 'বাল্মিকী প্রতিভা' নৃত্যনাট্যের 'আর না, আর না এখানে'– নটনারায়ণ রাগাশ্রয়ী। আমাদের আলোচনার তৃতীয় ও শেষপর্বে প্রবেশ করতে যাচ্ছি, আরেকটি রাগের সূত্র ধরে, যার নাম হেমন্ত। উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতে এ রাগটি সৃষ্টি হয়েছিল বিগত শতাব্দীর কোনো এক সময়ে। সম্ভবত ১৯৩০ বা ৪০ এর দশকে। এনিয়ে বেশ চিত্তাকর্ষক একটি কাহিনি আছে। বলছি। তবে তার আগে

বলে নিতে হবে যে, ১৯২৬ সালের এপ্রিল মাসে এবং সেটা ছিল সম্ভবত চৈত্র মাস, অন্তত কবির মনে চৈত্রই ছিল, এবং ঠিক এমনি দিনে, রবীন্দ্রনাথ একটি গান রচনা করেন–

আধেক ঘুমে নয়ন চুমে স্বপনও দিয়ে যায়।
শ্রান্ত ভালে যূথীর মালে পরশে মৃদু বায়।।
বনের ছায়া মনের সাথি, বাসনা নাহি কিছু–
পথের ধারে আসন পাতি, নাহি ফিরে পিছু–
বেণুর পাতা মিশায় গাথা নীরব ভাবনায়।।
মেঘের খেলা গগনতটে অলস লিপি লিখা,
সুদূর কোন স্মরণপটে জাগিল মরিচীকা।
চৈত্রদিনে তপ্ত বেলা তৃণ আঁচল পেতে
শূন্যতলে গন্ধ-ভেলা ভাসায় বাতাসেতে–
ভাসায় বাতাসেতে- বিজন বেদনায়।
কপোত ডাকে মধুশাখে বিজন বেদনায়।।

গানটির বাণী বলে দিচ্ছে, এটি বসন্ত ঋতুর গান এবং অষ্টম পঙ্‌ক্তিতে স্পষ্টতই চৈত্র মাসের উল্লেখ। গানটি শুরু হচ্ছে মধ্য সপ্তকের শুদ্ধ নিখাদ থেকে তার সপ্তকের ষড়জ ছুঁয়ে গান্ধারে পৌঁছে যায় এবং তারপর অবরোহণে ক্রমান্বয়ে সবকটি শুদ্ধ স্বরকে ছুঁয়ে যায় এবং আরোহনে রেখাক ও পঞ্চমকে বর্জন করে।

এই গানটির একটি অবিস্মরণীয় রেকর্ডের কথা এই সূত্রে বলতেই হবে। শিল্পী অমিতা সেন। রেকর্ড হয়েছিল, সম্ভবত ১৯৩০ এর দশকের প্রথমার্ধে কোনো এক সময়; কারণ, শিল্পী মাত্র ছাব্বিশ বছর বয়সে, ১৯৪০ সালের ২৪ শে মে, ইহলোক ত্যাগ করেন। এ তারিখটা ছিল তাঁর ২৬তম জন্মদিনের চার দিন পরে।

অনেক অনুসন্ধান করে অবশেষে রেকর্ডিংয়ের সময় সুনির্দিষ্টভাবে যা জানা গেল, তা হলো ১৯৩৫ সালে। তারিখ জানা গেল না। কিন্তু, আমাদের পক্ষে আপাতত এটুকুই যথেষ্ট।

প্রসঙ্গত, অমিতা সেনের ঠিক এক বছর পরে, ১৯৪১-এ রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণ ঘটে। কিন্তু, ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ হেমন্ত রাগটি সৃষ্টি করেছিলেন কত সালে, সেটা সঠিকভাবে জানতে পারিনি। একটু তলিয়ে দেখা যাক, সমস্যাটা কোথায়?

অনুসন্ধানটি তাহলে শুরু করা যাক ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁর নিজেরই বয়ান থেকে, যেটি অনুলিখন করেছিলেন শুভময় ঘোষ। বইটির নাম 'আমার কথা' আলাউদ্দীন খাঁ প্রথম প্রকাশ 'রত্নসাগর গ্রন্থমালা'য় ১৩৬৪ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ১৯৫৮ সালে এবং তার ২৩ বছর পরে প্রকাশিত হয়, বইটির 'আনন্দ' সংস্করণ।

বলা প্রয়োজন, শুভময় ঘোষ এই অনুলিখনের কাজটি করেছিলেন শান্তিনিকেতনে বসে এবং ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ তখন শান্তি নিকেতনেই। শুভময় ঘোষের বয়স তখন মাত্র তেইশ বছর।

এ হিসেবে পাওয়া যাচ্ছে বইটির প্রথমেই শুভময় লিখিত ভূমিকা থেকে, যদি আরো স্মরণে রাখি যে, তাঁর জন্ম ১৯২৯ সালে।

ভূমিকাটি এখানে উদ্ধৃত করছি–

এই বই ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁর পূর্ণাঙ্গ জীবনী নয় তাঁর সংগীত শিল্পের আলোচনাও নয়। তবে এখানে তাঁর জীবনের মূল সত্যটি প্রকাশ পেয়েছে, আর প্রকাশ পেয়েছে তাঁর সংগীতসাধনার ইতিবৃত্ত। বিশ্বভারতী ১৯৫২ সালে এই সংগীতগুরুকে দিনেন্দ্র অধ্যাপক পদে আহ্বান জানিয়ে শান্তি নিকেতনবাসীদের তাঁর সংগীত ও ব্যক্তিত্বের সঙ্গে পরিচিত হবার মহৎ সুযোগ দিয়েছিলেন। শান্তিনিকেতনে ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ দুমাস ছিলেন। দুমাসে সংগীত-শিক্ষার সূচনাও হয় না, কিন্তু সংগীত সাধক আল্লাউদ্দীনের সান্নিধ্যই শিক্ষাপ্রদ। তাঁর দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, আলাপ আলোচনা, ভারতীয় সংস্কৃতির এক দুর্লভ রত্নের সন্ধান পেয়েছিল। এই সান্নিধ্যের স্মৃতি তাদের প্রত্যেকের জীবনে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

বিনীত
শুভময় ঘোষ

অর্থাৎ এই বইটির অনুলিখন করা হয় ১৯৫২ সালে; কিন্তু পন্ডিত রবিশঙ্করের হেমন্ত রাগে সেজারের 78 RPM রেকর্ডটি হয়েছিল ১৯৪৮ সালে। সুতরাং খাঁ সাহেব রাগটি তার আগেই সৃষ্টি করেছিলেন, বলাই বাহুল্য। অর্থাৎ অনিবার্য সিদ্ধান্ত এটাই হতে পারে যে, তিনি রাগটি আরো আগেই সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু ঠিক কখন? যদি ধরে নিই, শান্তিনিকেতনে বসেই তিনি কাজটা করেছিলেন, তবে প্রশ্ন ওঠে, তিনি কি আগেও শান্তি নিকেতনে গিয়েছিলেন? উত্তরের একটা ইঙ্গিত আছে শুভময় ঘোষের ওই বইটির সূচনায় [২৩শে অক্টোবর তারিখ সকালে কলকাতা থেকে শান্তি নিকেতন ফিরছি। বোলপুরে বাসের কাছে খুব ভিড়। দেখলাম, তার মধ্যেই দাঁড়িয়ে আছেন এক বৃদ্ধ। পিঠে কাপড়ের খোলে জোড়ানো বাজনা। সঙ্গে একটি প্রিয়দর্শন ছোট ছেলে, তার কাঁধেও একটি বাজনা। ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ সঙ্গে তাঁর নাতি, আলী আকবর খাঁর ছেলে, আশিস খাঁ। যত্ন করে বাজনা দুটি তুলে বৃদ্ধ বসলেন। বাসে সবার সঙ্গে নিজে থেকেই আলাপ করে নিলেন। কথায় পূর্ববঙ্গের ছাপ এখনও খুব বেশি। আগেও এসেছেন শান্তিনিকেতনে। 'তখন গুরুজী ছিলেন। আবিসিনিয়ায় তখন যুদ্ধ ছিল। ইউরোপ যাব, তার আগেই এখানে ছিলাম। যখন যাব তখন গুরুজী বল্লেন, 'নন্দলাল আল্লাউদ্দীনের মাথাটা রেখে দাও। নন্দবাবুর এক ছাত্র (শ্রীরাম কিংকর) আমার মাথাটা রেখে দিল মূর্তিতে। তখন, আরও দাড়ি ছিল। নন্দবাবু, ভালো আছেন?' বাসে বসে বসেই খবর নিলেন থাকা খাওয়ার কী ব্যবস্থা। 'রুটি পাওয়া যাবে তো? আমি বাবা দিনে বাঙালী। রাত্রে পশ্চিমা।' অর্থাৎ, শান্তিনিকেতনে শুভময় ঘোষ যেবার আলাউদ্দীন খাঁর আত্মকথনের এই অনুলিপিটি গ্রহণ করেন, সেটা ছিল ১৯৫২ সাল এবং খাঁ সাহেব এসেছিলেন ওই বছরের ২৩শে অক্টোবর। কিন্তু তার আগের বার তিনি এসেছিলেন, তিনি নিজেই বলেছেন, 'তখন গুরুজী ছিলেন। অবিসিনিয়ায় তখন যুদ্ধ ছিল। ইউরোপ যাব, তার আগেই এখানে ছিলাম। উল্লেখিত এই যুদ্ধ হয়েছিল ইথিওপিয়া ও ইটালির মধ্যে এবং চলেছিল, ১৯৩৫ এর অক্টোবর থেকে ১৯৩৭ এর ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত। সুতরাং, ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ (সম্ভবত প্রথমবার) শান্তিনিকেতন এসেছিলেন ১৯৩৫ এর অক্টোবর থেকে ১৯৩৭ এর ফেব্রুয়ারির মধ্যে কোনো এক সময়। রবীন্দ্রনাথ তখনো সশরীরে বর্তমান এবং মনে হয়। এই সময়কালের মধ্যে কোনো এক সময় আলাউদ্দীন খাঁ সাহেব 'আধেক ঘুমে নয়ন চুমে'... গানটি শোনেন। জনশ্রুতি, এই গানটি শুনেই, (কে জানে, হয়তো অমিতা সেনের কণ্ঠেই, কারণ তাঁর কণ্ঠে তো গানটির রেকর্ড হয়েছিল ১৯৩৫ সালেই), হেমন্ত রাগটি সৃষ্টি করেন। হেমন্তরাগটির আরোহন অবরোহন, আবার বলছি, স গ ম ধ ন ম/স ন ধ প ম গ র স), কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এ সুর কোথায় পেয়েছিলেন? এ প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলতেই পারতাম, এ সুর তাঁরই সৃষ্টি।

এ সুর তাঁরই সৃষ্টি তাতে সন্দেহ নেই; কিন্তু তাঁর অনেক গানেই এ সুরের বীজ যে সুপ্ত হয়েই ছিল, তাতে সন্দেহ নেই। অনেক সঙ্গীতজ্ঞের মতে বিষ্ণুপুরের যে সোহিনী, যা শুদ্ধ মধ্যমযুক্ত (উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতে সোহিনী তীব্রমধ্যযুক্ত) তার আরোহণ অবরোহণ হলো– স গ ম ধ ন স/স ন ধ ম গ ঋ স। এই স্বর সমন্বয় আয়ত্ব পাই রবীন্দ্রনাথের প্রথম আদি তব শক্তি 'গানটিতে এবং এই গানটি তাঁর ভাষা গান পর্যায়ের। যার মূল গানটি ছিল হুবহু একই সুরে বহু প্রাচীন একটি ধ্রুপদ যার লেখক জগপৎ শুকুল। এবং গানটির বাণী ছিল– প্রথম আদ শিবশক্তি নাদ পরমেশ্বর... ইত্যাদি। যাই হোক, বিষ্ণুপুরের এই সোহিনীর অবরোহণে পঞ্চমকে যোগ করে এবং কোমল রেখাব (ঋ) কে শুদ্ধ রেখাব দিয়ে প্রতিস্থাপিত করলে আমরা পাই হেমন্তের স্বর সমন্বয়।

কিন্তু, এভাবে হিসেব মেলানো গেলেও, রবীন্দ্রনাথ ঠিক এই ভাবেই সুরটি সৃষ্টি করেছিলেন– এটা জোর দিয়ে বলা যায় না।
কাজটি অত, সহজ, একথা বিশ্বাস করা কঠিন। •

বিশ্বদেব মুখোপাধ্যায় ॥ কবি, প্রাবন্ধিক ও সঙ্গিতজ্ঞ

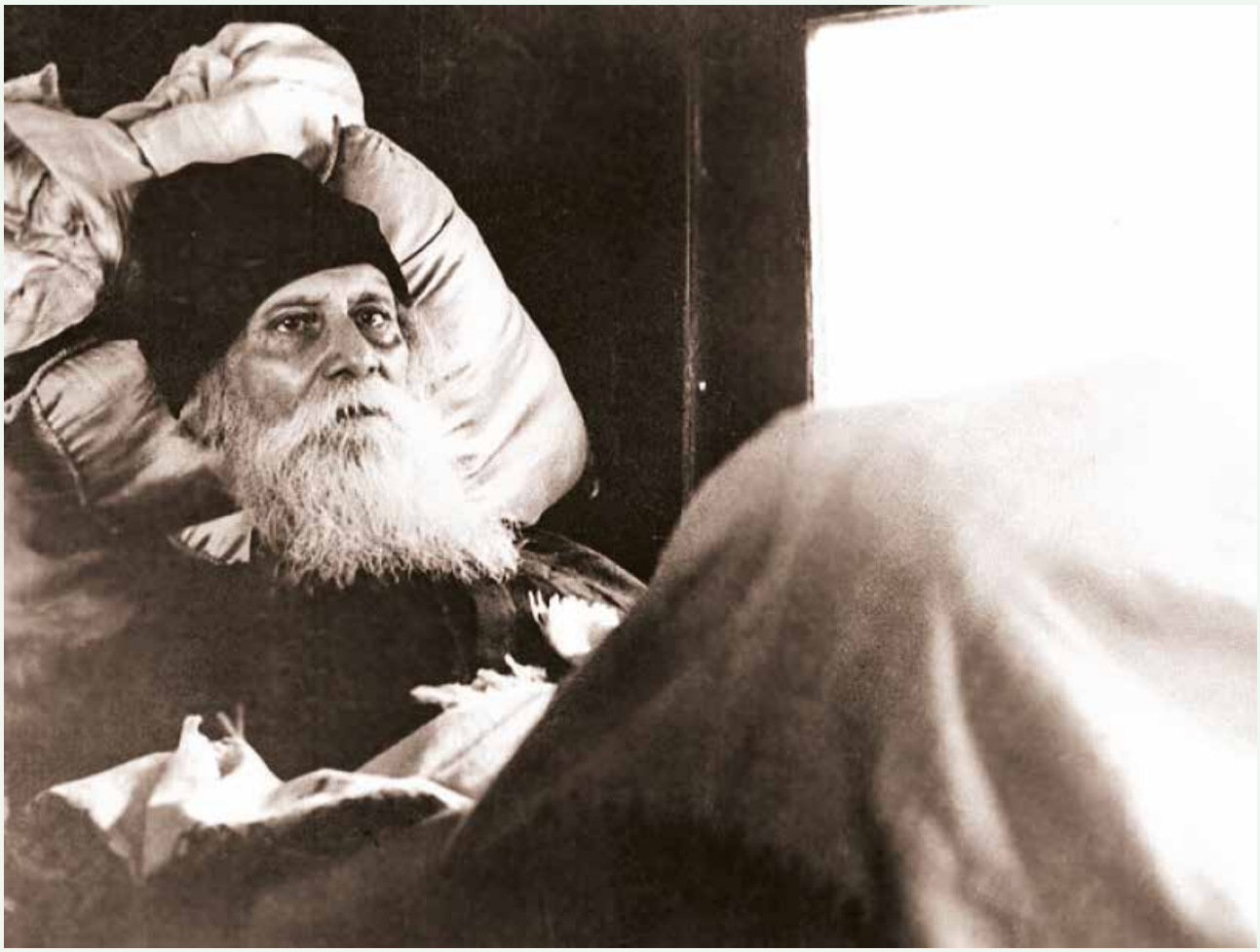

মানবতার সংকট ও রবীন্দ্রনাথ

ভীষ্মদেব চৌধুরী

প্রবন্ধ

মানুষ কখনো কখনো আত্মঘাতী হয়, যুদ্ধে মানুষের মৃত্যু হয়; রোগ মহামারি এসে মানুষকে ধ্বংস করে। কিন্তু মানুষ শেষ পর্যন্ত বাঁচে। রবীন্দ্রনাথ এই বিশ্বাসে বিশ্বাসী ছিলেন। এই কারণে মৃত্যুর প্রাকলগ্নে রোগশয্যায় তিনি যে-সব কবিতা লিখেছেন সেখানে জীবনকে এবং মৃত্যুকে একটি সিঁড়ি হিসেবে, একটি নতুন জন্মের সম্ভাবনা হিসেবে দেখেছেন। দাবি আদায়ের জন্য আমরা মানবশৃঙ্খলের আয়োজন করি। এটি হয়তো মানব-সংহতি প্রদর্শনের একটি উপায়। কিন্তু আমরা যথার্থ অর্থেই এক অনন্ত মানবপ্রবাহের অংশীদার। এই বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথ পোষণ করতেন। কিন্তু আমরা জানি যে, মানবতা সংকটেরও মুখোমুখি হয়। নানা সময় নানা অপশক্তি মানবতার অগ্রযাত্রায় পথ রোধ করে দাঁড়ায়। জীবনে রোগ আসে, শোক আসে। আমরা তো এখন এক ভয়াবহ মহামারিকাল অতিক্রম করছি। বলছি মহামারি কিন্তু প্রকৃত অর্থে অতিমারি। এটিও মানবসভ্যতার জন্য, মানবতার জন্য একটি সংকট। কিন্তু এর পেছনে হয়তো প্রকৃতির প্রতিশোধ আছে, আবার এর মধ্যে কোনো ষড়যন্ত্র আছে কিনা সেটাও আবিষ্কারসাধ্য। কিন্তু আমরা সহজভাবে বুঝি এটি প্রাকৃতিক

তবে মানবতাকে স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্য, মানবতাকে রুদ্ধ করে দেওয়ার জন্য আমাদের মধ্য থেকে নানা অপশক্তি কিন্তু উঠে আসছে। তারা মানবতাকে ধ্বংস করার আশঙ্কা তৈরি করে; মানবতাকে স্তব্ধ করার চেষ্টা করে। এর মধ্যে একটি প্রধান বিষয় হচ্ছে যুদ্ধ। যুদ্ধ এবং তার সঙ্গে রাজনৈতিক মানসতা থেকে উপজাত আরও কিছু বৈশিষ্ট্য এতে যুক্ত হয়। যেমন আমরা বলতে পারি সাম্প্রদায়িকতার কথা, বলতে পারি ধর্মান্ধতা, মৌলবাদিতা, অবিশ্বাস, সন্দেহের কথা–এইগুলি আমাদের অগ্রযাত্রার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক। কাজেই মানবতার সংকটকে যদি এভাবেই সংজ্ঞার্থের পরিধির মধ্যে নিয়ে আসি, তাহলে বুঝব, যা কিছু মানবতার বিপক্ষে, যা কিছু মানবতার গতিধারাকে স্তব্ধ করে দিতে চায় তাই মানবতার সংকট। এবং এই মানবতার সংকট থেকে উত্তরণের জন্য আমি বলব আমাদের সহায়, আমাদের শরণ অর্থাৎ আশ্রয়ের শক্তি রবীন্দ্রনাথ। এই কারণেই রবীন্দ্রনাথকে আমরা স্মরণ করছি। রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে বাণী সংগ্রহ করে, প্রেরণা গ্রহণ করে আমরা উজ্জীবিত হচ্ছি। পথ তৈরি করে চলার পথের বাধাকে আমরা অতিক্রম করে যাচ্ছি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবদ্দশায় দুটি বিশ্বযুদ্ধ প্রত্যক্ষ করেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরুর দ্বিতীয় বর্ষে তাঁর জীবনাবসান হয় এবং এই জীবনাবসান ঘটার আগে সমৃদ্ধ প্রাজ্ঞ আরো সংহত করে বললে স্থিতপ্রাজ্ঞ রবীন্দ্রনাথ ভবিষ্যৎদ্রষ্টার মতো এক ভয়াবহ আগামীকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। বর্তমানের পথে দাঁড়িয়ে তিনি দেখেছিলেন যে পশ্চিমা বিশ্ব কীভাবে মারণোদ্যত হয়ে উঠছে। কীভাবে বিজ্ঞানকে ব্যবহার করে ব্যক্তিস্বার্থ হাসিল করছে। বিজ্ঞান তো বিশেষ জ্ঞান, মানুষ সেই জ্ঞানকে আবিষ্কার করে। জ্ঞান আছে, কিন্তু তাকে নতুন করে আবিষ্কার করতে হয়। এই আবিষ্কার করেছে মানুষ মানুষের কল্যাণের জন্য। কিন্তু মানুষই তার ব্যক্তিস্বার্থে, গোষ্ঠীস্বার্থে, তার রাজনৈতিক স্বার্থে, জাতিগত সংকীর্ণতা থেকে জাতীয়তাবাদী চিন্তার স্বার্থে নানারকম যুদ্ধের পাঁয়তারা করেছে। নানাভাবে মানুষকে অসহায় করেছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের এক বছর আগে রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার লাভ করলেন। তার আগের বছর ১৯১২ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ইংল্যান্ডে গেলেন। ইংল্যান্ডে এর আগেও তিনি গেছেন। কিন্তু এই যাত্রাটি তাঁর জন্য বিশেষ ছিল। বিশেষ ছিল এই কারণে যে, তিনি পূর্বদেশ বা প্রাচ্যের যে স্থিরতা-ধীরতা, এর বিপরীতে পশ্চিমের অস্থিরতা, ইতিবাচক অর্থে যদি বলি গতিশীলতা, প্রত্যক্ষ করলেন। নিজের জীবনের তথা ভারতীয় জীবনের স্থবিরতার বিপরীতে চলমান গতিময় যন্ত্রনির্ভর-প্রযুক্তিনির্ভর যে নতুন বিশ্ব তাঁর সামনে সেদিন উন্মোচিত হলো সেই বিশ্ব কিন্তু সম্ভাব্য যুদ্ধের জন্য মানুষের মধ্যে আশঙ্কাও নিয়ে এলো। এবং অচিরেই এই যুদ্ধ মানুষের মধ্যে দারিদ্র্য নিয়ে এসেছে, অবিশ্বাস তৈরি করেছে। ইতিহাসের পাতায় কিংবা পুরাণের রাজ্যকে নিয়ে বিশ্বসাহিত্যের যে ক্লাসিকস্ সেখানেও আমরা যুদ্ধের কথা জেনেছি। জাতিগত যুদ্ধ, বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর একত্র সমাবেশকৃত যুদ্ধও আমরা মিথের জগতে পেয়েছি। ট্রয় যুদ্ধের কথা আমরা বলতে পারি, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের কথা আমরা বলতে পারি, বলতে পারি পানিপথের যুদ্ধের কথাও। কারবালার যুদ্ধের কথাও আমরা স্মরণ করতে পারি। কিন্তু স্বার্থান্ধ মানুষ যখন একে অপরের প্রতিপক্ষ হয়ে মানবতার সংকটকে, আমি বলব একটা বিপর্যয়ের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিল তখন রবীন্দ্রনাথ কী করলেন? প্রথম বিশ্বযুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ এক অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা অর্জন করলেন। এর বিরুদ্ধে তিনি সরাসরি সোচ্চার হননি বটে, তবে নিজের মনোজাগতিক প্রতিক্রিয়াকে তিনি নানা আখ্যানে-প্রতিমায়-রূপকে রূপান্বিত করেছেন সমকালীন উপন্যাসে কিংবা কবিতায়। জীবনের গতিময়তা এবং গতি ও স্থিতির দ্বন্দ্ব যে জীবনের একমাত্র পথ নয়–এই ধারণাগুলোকে তিনি তাঁর সাহিত্যে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করলেন। জীবনকে আধুনিকতার স্তরে উত্তীর্ণ করার ক্ষেত্রে যে সংকট আছে, যে সমস্যা আছে সেগুলোকে উপলব্ধি করে তিনি তাঁর কথাসাহিত্য রচনা করলেন, কবিতা রচনা করলেন। এবং একটি পর্যায়ে আমরা দেখব এই যুদ্ধান্তে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে জালিয়ানওয়ালবাগ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হলে তিনি তাঁর ব্রিটিশপ্রদত্ত উপাধি পরিত্যাগ করলেন। এ-সময়ে ভারতীয় রাজনীতিতে মহাত্মা গান্ধীর আবির্ভাব ঘটে গেছে। ইংল্যান্ড থেকে গান্ধী গিয়েছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকায়। সেখান থেকে ভারতবর্ষে এসে আকস্মিকভাবেই তিনি রাজনীতির নেপথ্য শক্তি হয়ে উঠলেন। দলীয় রাজনীতির যে সদস্য পদ, আনুষ্ঠানিকভাবে তা তিনি গ্রহণ করেননি। কিন্তু তিনি নেপথ্যের চালিকাশক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলেন। অতঃপর তাঁরই আহ্বানে পরিচালিত হলো সর্বভারতীয় অহিংস-অসহযোগ আন্দোলন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যে যে সময় সেখানে আমরা দেখব রবীন্দ্রনাথ চিন্তাবিশ্বের সংকট আর বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রাকে বেশ মনোযোগ দিয়ে প্রত্যক্ষ করেছেন; অনুভব করার চেষ্টা করেছেন। আলবার্ট আইনস্টাইনের সাথে একবার নয় দুবার তাঁর সাক্ষাৎ ও আলাপ হয়েছে। বিজ্ঞানের শেষ কোথায় আর ভাবের অনুভবময়তার শুরু কোথায়– তাঁদের এই দুই জিজ্ঞাসার আলাপচারিতা গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ আছে। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও গ্রন্থে সেগুলো পাওয়া যায়। শিক্ষার্থীরা বিশেষত বিজ্ঞানের শিক্ষার্থীরা সন্ধান করে পড়তে পারবেন ওই কথোপকথনের কথামালা। দেখবেন যে, একটি জায়গায় এসে দুজন দুজনার কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন। অর্থাৎ, দুজনই বলছেন আপনি শুদ্ধ। এভাবে রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত রাখার চেষ্টা করেছেন। পরিবেশ বিপর্যয়ের কথা আমি বলিনি। কিন্তু পরিবেশ বিপর্যয়ও মানবতার জন্য একটি বড়ো সংকট। এই সংকট আস্তে আস্তে ঘনীভূত হচ্ছে। এবং এই সংকট আমাদেরকে বর্তমান একবিংশ শতাব্দীর শেষে অথবা ভবিষ্যৎ শতাব্দীর শেষে কোন পর্যায়ে নিয়ে যাবে আমরা জানি না। কিন্তু এটিও একটি বড়ো সংকট মানবতার। রবীন্দ্রনাথের কাছে এই জন্যও আমাদের আশ্রয়ের প্রার্থনা করতে হবে। আমরা জানি যে জীব-পদার্থবিদ, জীববিজ্ঞান ও পদার্থবিজ্ঞান এই দুটিকে একত্র করে যিনি গবেষণায় একটি বিশ্বমান প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তিনি আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু। সেই জগদীশচন্দ্র বসু ছিলেন রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। জগদীশচন্দ্র বসুর অন্যতম পৃষ্ঠপোষকও ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। বিজ্ঞানচর্চায় তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন তিনি। সাহিত্যের শিক্ষার্থীরা জানেন যে রবীন্দ্রনাথ শেষ জীবনে বিজ্ঞাননির্ভর গল্প লিখছেন, 'ল্যাবরেটরি' গল্প। সেখানে তিনি একজন ভারতীয় বিজ্ঞানীর বিজ্ঞানসাধনাকে নিষ্কণ্টক রাখার জন্য মানুষের যে ত্যাগ-তিতিক্ষা তাকে শিল্পিত করেছেন। গল্পটিতে জ্ঞানবিকাশের অগ্রযাত্রায় নারীর ভূমিকাকেও রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেছেন। সেই নারী সোহিনী। সোহিনীর আত্মত্যাগ ও কর্তব্যনিষ্ঠা এবং বিজ্ঞানী স্বামীর বিজ্ঞানসাধনাকে সমুন্নত রাখার চেষ্টায় সোহিনীর সংকল্প, উদ্যম ও ত্যাগ অনন্য। আবার ফিরে আসছি রবীন্দ্রনাথের ওপর জগদীশচন্দ্র বসুর অনুপ্রেরণা সঞ্চারের কথায়। অনুপ্রাণিত রবীন্দ্রনাথও পরিবেশ বিষয়ে ভেবেছিলেন। পরিবেশচিন্তাকে তিনি একটি কর্মসূচির মাধ্যমে বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করেছিলেন। পরিবেশের যে দূষণ তা থেকে মুক্তির জন্য, আমরা জানি আমাদের সবচেয়ে বেশি ঋণ অক্সিজেনের কাছে, গাছের কাছে। বিশ্বভারতীতে বৃক্ষরোপণ উৎসবের প্রচলন করে রবীন্দ্রনাথ মরুজয়ী আদিপ্রাণ বৃক্ষের জয়গাথা সমুন্নত করেছিলেন।

বিশ শতকের তৃতীয় দশকের শুরু থেকেই ইউরোপে ফ্যাসিবাদের আত্মপ্রকাশ ঘটে। এই ফ্যাসিবাদ আবার নতুন করে যুদ্ধের দামামা ধ্বনিত করে তোলে। পৃথিবীর গুণীজন, মানবতাবাদী কর্মী লেখক শিল্পী এঁরা একত্র হন, তাঁরা প্রতিবাদ করেন এবং তাঁরা বুঝতে পারেন যে বিশ্ব আরেকটি সংকটের সামনে উপনীত হচ্ছে। আবার একটি যুদ্ধের আশঙ্কা ঘনীভূত হয়ে উঠছে। মুসোলেনির সঙ্গে একটি ইতিবাচক সম্পর্ক রবীন্দ্রনাথের ছিল। কিন্তু ফ্যাসিবাদ যখন একটি মারণোন্মুখ মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করল, রবীন্দ্রনাথ তখন প্রকাশ্যে মুসোলিনির বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন। এবং আন্তর্জাতিকভাবে রোমা রোঁলা প্রমুখ ব্যক্তির নেতৃত্বে যে ফ্যাসিবিরোধী আন্দোলন-প্রতিবাদ দানা বেঁধে উঠল তার অন্যতম প্রধান পুরুষ হয়ে উঠলেন রবীন্দ্রনাথও। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় আমরা দেখব লোকভয়-রাজভয়কে উপেক্ষা করার কথা তিনি বলেছেন; ভীতিকে জয় করার কথা বলেছেন। রবীন্দ্রনাথ মনেপ্রাণে বিশ্বস্রষ্টার পরম শক্তিতে বিশ্বাসী ছিলেন। এই বিশ্বাসের শক্তি, তাঁকে বাড়তি প্রেরণা যোগান দিয়েছিল। এই কারণে রবীন্দ্রনাথের কাব্যের কোথাও হতাশার কথা পাব না, বিষণ্নতার কথা পাব না। বেদনার কথা পাব, শোকের কথা পাব–কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি শোককে জয় করে ফেলেন, শেষ পর্যন্ত তিনি বেদনাকে অতিক্রম করে যান। একজন বেদনাবিজয়ী মানুষ হয়ে ওঠেন। এ-কারণেই জীবনের অন্তিমে রবীন্দ্রনাথ বলতে পারেন, 'সমুখে শান্তি পারাবার–/ভাসাও তরণী হে কর্ণধার।/ তুমি হবে চিরসাথি, লও লও হে ক্রোড় পাতি–/অসীমের পথে জ্বলিবে জ্যোতি

ধ্রবতারকার।।'

এভাবেই রবীন্দ্রনাথ একের পর এক, আমি বলব তাঁর জীবনসত্যকে মানবসত্যে রূপান্তরিত করেছেন। তিনি মানুষের মুক্তির আনন্দকে যাপন করতে চেয়েছেন। যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঘনীভূত হয়ে উঠল, এই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-কালে তিনি পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখে বললেন যে, পশ্চিমা বিশ্ব প্রধানত ইউরোপ এবং তার সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যুক্ত হয়ে সভ্যতার গর্বে গর্বিত হওয়ার ভান করে মানবসভ্যতার সংকটকে ঘনীভূত করে তুলেছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবদ্দশায় এই যুদ্ধের পরিসমাপ্তি দেখেননি আমরা জানি। আমরা জানি যে তাঁর মৃত্যুর বছর দুয়েকের মধ্যে পশ্চিমি বিশ্ব পারমাণবিক যুদ্ধাস্ত্র তৈরির যুগে প্রবেশ করেছিল এবং সেই পারমাণবিক বোমা এশিয়ার জাপানে বিস্ফোরিত হয়েছিল। এই বিষয়গুলো রবীন্দ্রনাথ দেখে যাননি কিন্তু এগুলো তাঁর আশঙ্কার অন্তর্ভুক্ত ছিল। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন পৃথিবী একটি ভয়াবহ পরিস্থিতির মুখোমুখি হচ্ছে এবং সেইখানে আমি বলব, রবীন্দ্রনাথ একটা বিশ্বাসহীনতার শেষ সীমায়, দর্শনের পরিভাষায় যাকে বলে বর্ডার লাইন সিচুয়াশান, সেই দেয়ালে পিঠ ঠেকে-যাওয়া অবস্থায় দাঁড়িয়ে কী আশার কথা শুনিয়েছেন আমি সেই কথা এবার উল্লেখ করতে চাই। উনিশ শ' বায়ান্নো সালে আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গিয়েছিলেন নয়া চীন। তাঁর স্মৃতিকথামূলক সেই গ্রন্থের প্রথম পৃষ্ঠাতেই দেখবেন যে, নয়া চীনের নতুন জীবন, তাদের অগ্রগতি, তাদের উচ্ছ্বাস-আনন্দ–এটি তাঁকে আপ্লুত করেছিল। 'রাশিয়ার চিঠি'তে বিপ্লবোত্তর রুশদেশের জনশাসন ও স্বধীনতা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মনে যে প্রশ্নটি জেগেছিল সেই প্রশ্নটি কিন্তু বঙ্গবন্ধুর মনেও জেগেছিল নয়া চীন ভ্রমণে। তাঁরও মনে হয়েছিল, এখানে অন্য কোনো রাজনৈতিক মতাদর্শ ব্যক্ত করার সুযোগ নেই। এটি তাঁকে আশঙ্কায় ফেলেছিল। আমি রবীন্দ্রনাথের সোভিয়েত ভ্রমণ, বিশেষত মস্কো নগরী ভ্রমণ এবং বঙ্গবন্ধুর নয়া চীন ভ্রমণের প্রসঙ্গটি তুললাম এই কারণে যে, আজকের বিশ্বযুদ্ধ আক্রান্ত। আমরা জানি যে বিগত শতকের নব্বইয়ের দশকের সূচনাকালে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের যে কাঠামো সেটি ধসে গেছে। যে রাষ্ট্রপুঞ্জ ছিল সেই রাষ্ট্রগুলো এখন বিচ্ছিন্ন। ইউক্রেনের পূর্বাঞ্চলে যে রুশভাষী মানুষ আছেন, আপাতভাবে মনে হচ্ছে তাদের অধিকারের প্রশ্নে রুশরা সতর্ক, সংবেদনশীল। কিন্তু আমরা জানি ইউক্রেনের পেছনে ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং ন্যাটোর অনেক ইন্ধন আছে। যুদ্ধ নানাভাবে হয়। পণ্যকে অবলম্বন করে যুদ্ধ হয়। নানাভাবে অবরোধ তৈরি করে যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া সঞ্চারিত হয়। আমরা দেখার চেষ্টা করবো এইসব সমস্যাসংকুল অবস্থায় রবীন্দ্রনাথ কীভাবে আমাদের সহায় হয়ে ওঠেন। বঙ্গবন্ধু রবীন্দ্রনাথের অনুরাগী ছিলেন। আমি জানি না, এমন কোনো তথ্য আমি পাইনি, রবীন্দ্রনাথের সাথে বঙ্গবন্ধুর সাক্ষাৎ হয়েছিল কি না। কিন্তু বঙ্গবন্ধু রবীন্দ্রনাথকে হৃদয়ে ধারণ করেছিলেন। তাঁর গান তিনি শুনতে ভালোবাসতেন এবং আমরা জানি আমাদের দুই কবি, এক বৃন্তে প্রস্ফুটিত দুই কবি রবীন্দ্র-নজরুল। নজরুল আমাদের জাতীয় কবি। রবীন্দ্রনাথ আমাদের জাতীয় সংগীতের রচয়িতা। রবীন্দ্রনাথকেও বঙ্গবন্ধুর মতোই বাংলাদেশও তার হৃদয়ে ধারণ করেছে। আজকের দিনে সমগ্র বিশ্ব মানবতার যে মহা-সংকট, তার দুটি প্রধান দিক, একটি হচ্ছে দুই দেশের যুদ্ধের ভেতর থেকে বৃহত্তর মহাযুদ্ধের আশঙ্কা, অন্যটি বৈশ্বিক মহামারি। রবীন্দ্রনাথ মহামারি প্রত্যক্ষ করেছেন, অতিমারি দেখেছেন কি না জানি না। মহামারি প্রসঙ্গ, বিশেষত প্লেগ রোগের প্রভাবে মানুষ ও জনপদ কীভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে, মৃত্যু আসছে–এগুলো তাঁর রচনায় বিধৃত আছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমকালে রচিত চতুরঙ্গ উপন্যাসেও তার পরিচয় পাই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁর মৃত্যুর প্রাক্কালে পশ্চিমি বিশ্বের মনোজাগতিক মহামারি প্রত্যক্ষ করে অভূতপূর্ব বেদনায়-আশঙ্কায় বিমর্ষ হলেন। যুদ্ধের ভয়ঙ্কর রূপের মধ্যে তিনি দেখলেন মহামারির প্রতিরূপ। একেই তিনি অভিহিত করেছেন 'সভ্যতার সংকট' অভিধায়। রবীন্দ্রনাথ এই মহা-সংকটকে উপলক্ষ্য করে এক অনাগত অন্ধকার ভবিষ্যতের আশঙ্কায় দীর্ণ হলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কালে, ১৯৪১ সনের আগস্টে জীবনাবসান হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের। তার মাস তিনেক আগে পহেলা বৈশাখে রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় সর্বশেষ জন্ম উৎসব ২৫ বৈশাখ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তাঁর লেখা একটি প্রবন্ধ, ছোটো তিন-চার পৃষ্ঠার পুস্তিকা আকারে পরিবেশিত হয়। সেই সভায় আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন সেই প্রবন্ধটি পাঠ করেন। উত্তরকালে বহুল পঠিত এই প্রবন্ধই ছিল রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাসভঙ্গ ও নতুন বিশ্বাস স্থাপনের স্মারক-লিখন : 'সভ্যতার সংকট'। স্থিতপ্রাজ্ঞ রবীন্দ্রনাথ অদূরবর্তী মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে ওই সভ্যতার সংকটকে কীভাবে দেখেছিলেন এবং কীভাবে আশার বাণী উচ্চারণ করে বিশ্বাসনিহিত মানবসংহতির জয়গান করেছিলেন, বক্তৃতার উপান্তে শ্রদ্ধার সঙ্গে তা স্মরণ করব। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন : 'পাশ্চাত্য জাতির সভ্যতা অভিমানের প্রতি শ্রদ্ধা রাখা অসাধ্য হয়েছে। সে তার শক্তিরূপ আমাদের দেখিয়েছে, মুক্তিরূপ দেখাতে পারেনি। সমস্ত য়ুরোপে বর্বরতা কীরকম নখদন্ত বিকাশ করে বিভীষিকা বিস্তার করতে উদ্যত। এই মানবপীড়নের মহামারী পাশ্চাত্য সভ্যতার মজ্জার ভিতর থেকে জাগ্রত হয়ে উঠে আজ মানবাত্মার অপমানে দিগন্ত থেকে দিগন্ত পর্যন্ত বাতাস কলুষিত করে দিয়েছে। ...আজ আশা করে আছি, পরিত্রাণকর্তার জন্মদিন আসছে আমাদের এই দারিদ্র্যলাঞ্ছিত কুটীরের মধ্যে; অপেক্ষা করে থাকব, সভ্যতার দৈববাণী সে নিয়ে আসবে, মানুষের চরম আশ্বাসের কথা মানুষকে এসে শোনাবে এই পূর্বদিগন্ত থেকেই। আজ পারের দিকে যাত্রা করেছি–পিছনের ঘাটে কী দেখে এলুম, কী রেখে এলুম, ইতিহাসের কী অকিঞ্চিৎকর উচ্ছিষ্ট সভ্যতাভিমানের পরিকীর্ণ ভগ্নস্তূপ! কিন্তু, মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষা করব। মনুষ্যত্বের অন্তহীন প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম বলে বিশ্বাস করাকে আমি অপরাধ মনে করি।'

এর অন্তত এগারো বারো বছর পরে ঔপন্যাসিক আর্নেস্ট হেমিংওয়ে তাঁর *দ্য ওল্ড ম্যান এন্ড দ্য সি* উপন্যাসে লিখেছিলেন, 'A man can be destroyed but not defeated'। রবীন্দ্রনাথের কথারই এক ভিন্নাঙ্গিক প্রতিধ্বনি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই প্রবন্ধটির শেষে প্রবন্ধে উল্লেখিত সেই পূর্বদেশের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে উপস্থাপন করছেন একটি কবিতা, যেটি তাঁর সর্বশেষ কাব্যগ্রন্থ শেষলেখার ৬ সংখ্যক কবিতা হিসেবে পরে সংকলিত হয়েছে। সেই কবিতায় তিনি বলছেন, 'ওই মহামানব আসে।/ দিকে দিকে রোমাঞ্চ লাগে/মর্তধূলির ঘাসে ঘাসে।।/সুরলোকে বেজে ওঠে শঙ্খ,/নরলোকে বাজে জয়ডঙ্ক/এল মহাজন্মের লগ্ন/আজি অমারাত্রির দুর্গতোরণ যত/ধূলিতলে হয়ে গেল ভগ্ন।/উদয়শিখরে জাগে মাভৈঃ মাভৈঃ/নবজীবনের আশ্বাসে।/জয় জয় জয় রে মানব-অভ্যুদয়/মন্দ্রি-উঠিল মহাকাশে।।' কেউ কেউ এবং আমি নিজেও এরকম একটি ধারণা পোষণ করি যে, প্রবন্ধ ও কবিতায় রবীন্দ্রনাথ পূর্বদেশ তথা পূর্ব-ভারত অথবা প্রাচ্য থেকে মানব অভ্যুদয় ঘটার, মানবতার বাণীকণ্ঠ হয়ে মহামানবতুল্য মহিমা নিয়ে কারও আত্মপ্রকাশের যে-কথা বলেছেন, সেই একজনের প্রতিফলন বা ভাবমূর্তি আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবরের মধ্যে প্রতিভাসিত।। এই একটি ভূখণ্ডের মধ্য থেকে বিশ্ব-মানবতার কণ্ঠস্বর হিসেবে বঙ্গবন্ধুর যে আত্মপ্রকাশ হয়তো-তা রবীন্দ্রনাথের আকাঙ্ক্ষারই প্রতিফলন অথবা ভবিষ্যৎ-দর্শনের বাস্তবায়ন।

রবীন্দ্রনাথ এভাবে, এবং নানাভাবে আমাদের পথ দেখিয়েছেন। সভ্যতার বিপর্যয়ে-সংকটে তিনি আমাদের সহায়। করোনা অতিমারির হামলা থেকে বিশ্বমানব এখনো মুক্ত হয়নি। অন্যদিকে মানবসম্ভূত অথচ মানবতাবিরোধী নানামুখী হুমকি ও আশঙ্কার মধ্যে ইউরোপের একাংশে যুদ্ধ এখনো বিরাজমান। এক ভয়াবহ অর্থনৈতিক দুর্বিপাক ও ভীতিতে আচ্ছন্ন হয়ে আছে বিশ্ব-জনমানস। এটি মানবতার এক মহাসংকট। এই সংকট থেকে উত্তরণের জন্য, কূটনীতি-অর্থনীতি-সমরাস্ত্রনীতি ইত্যাদি সবকিছুকে গুরুত্ব দিয়েও আজকে নৈতিকতা, মানুষের প্রতি ভালোবাসা এবং মঙ্গলবোধকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে। আর সেই মানবতার পাঠ আমরা গ্রহণ করতে পারি রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকেই। রবীন্দ্র-সাগরের অতলে লুকিয়ে আছে কত-শত বিশল্যকরণী, অসুস্থ মনসতাকে যা আরোগ্যের আনন্দে পূর্ণ হয়ে উঠবে। •

[৮ মার্চ ২০২২ রবীন্দ্রজয়ন্তী উপলক্ষ্যে ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রদত্ত একক বক্তৃতার পরিমার্জিত লিখিত-রূপ।]

ভীষ্মদেব চৌধুরী ॥ প্রাবন্ধিক ও অধ্যাপক

প্রবন্ধ

কাজী নজরুল ইসলাম

নতুন নন্দনের নকিব

কুদরত-ই-হুদা

কাজী নজরুল ইসলাম জন্মগ্রহণ করেছিলেন উনিশ শতকের শেষ বছর; ১৮৯৯ সালে। আর লেখালেখিতে আত্মপ্রকাশ করেন বিশ শতকের দশের দশকের শেষ বছর; ১৯১৯ সালে। তখন তাঁর বয়স বিশ বছরের মতো। ১৯১৯ সালে কয়েক মাসের ব্যবধানে তিনি একযোগে সাহিত্যের তিনটি শাখায় আত্মপ্রকাশ করেন; গল্প, কবিতা ও প্রবন্ধ। তখন তিনি হাবিলদার পদবি নিয়ে ব্রিটিশ সৈন্য হিসেবে লেফট্-রাইটে ব্যস্ত করাচিতে। আর মাঝেমধ্যে লেখালেখি করেন। সাহিত্যের তিন শাখায় প্রকাশিত ওই তিনটি লেখাই বাংলা সাহিত্যে অভিনব কিছু ছিল না। কিন্তু তিনটি সাহিত্যকর্মের মধ্যেই চোখে পড়ার মতো একটা অস্থিরতা ছিল। লেখাগুলোর নামের মধ্যেই সেই অস্থিরতার আভাস পাওয়া যায়; 'বাউণ্ডলের আত্মকাহিনী' (গল্প), 'মুক্তি' (কবিতা) এবং 'তুর্ক মহিলার ঘোমটা খোলা' (প্রবন্ধ)। সাহিত্যজীবনের শুরুতে নজরুল যেন নিজের দিকে, নিজের সময়ের দিকে আসার জন্যে ডানা ঝাঁপটাচ্ছিলেন

কিন্তু উনিশ শতকের সাহিত্য-কাঠামো ও চিন্তাকাঠামো থেকে যেন কিছুতেই মুক্ত হতে পারছিলেন না। খুব দ্রুতই তিনি আসবেন নগর কলকাতায় এবং নিজেকে ও নিজের কালের কল্লোলকে ঠিক ঠিক অনুধাবন করে উঠবেন। সেটার শুরু ১৯২১ সালের দিক। ১৯২১ সালের শেষ নাগাদ নজরুল খুব স্পষ্ট ভাষায় বলে উঠবেন, 'আপনারে আমি চিনেছি আমার খুলিয়া গিয়াছে সব বাঁধ'।

ওই যে বলছিলাম, নজরুলের জন্মের সালটির কথা। সেবছর নাগাদ বা নজরুলের কিশোর বয়স অব্দি আধুনিক বাংলা সাহিত্যের গতি-প্রকৃতিটা একটু দেখে নেওয়া দরকার। তাহলেই নজরুলকে বোঝা ও পড়াটা সহজ হয়ে যাবে। নজরুল কীভাবে নতুন নন্দনের নকিব তাও আমাদের কাছে স্পষ্ট হবে।

নজরুলের আগের আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বয়স একশো বছরের কিছু বেশি। একেবারে সাল ধরে বলতে গেলে একশ উনিশ বছর। বিশ শতকের আগের আধুনিক বাংলা সাহিত্যকে প্রধান প্রবণতার দিক এককথায় যদি ধরতে চাই তাহলে বলতে হবে, এই সাহিত্য প্রধানত ইউরোপীয় চিন্তা-চেতনা ও সাহিত্যের প্রেরণাজাত। কারণ, সমগ্র উনিশ শতক আসলে বাঙালির 'আধুনিক' হওয়ার প্রচেষ্টার কাল। ইংরেজের বইপত্র ও সঙ্গ-সহবতের ভেতর দিয়ে এই কাজটি আস্তে আস্তে হয়েছে। একটা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি এই চেষ্টা-চরিত্রের মাধ্যমে গড়ে উঠেছিল। এই শ্রেণিটি যদিও খুব ছোট ছিল তবু তারাই আধুনিক হওয়ার জন্য উদগ্রীব পরবর্তী শিক্ষিত বাঙালির চিন্তা ও রুচিকে শাসন করেছে তাদের বিচিত্র সৃজনকর্ম ও সামাজিক কাজকর্মের ভেতর দিয়ে।

এই শ্রেণিটির তৎপরতা ও প্রভাবের পরিধি সম্পর্কে বলতে গিয়ে বিনয় ঘোষ কলকাতার আশপাশের ১৫-২০ বর্গমাইলকে নির্দেশ করেছেন। আর সুশোভন সরকার, বিনয় ঘোষসহ অনেক ঐতিহাসিক এই নবজাগরণের শ্রেণিচরিত্র শনাক্ত করতে গিয়ে উচ্চবর্ণের হিন্দু আর জমিদার শ্রেণির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকার কথাও বলেছেন। একারণে তাঁরা মনে করেন উনিশ শতকের রেনেসাঁস সর্বপ্লাবী ছিল–একথা পুরোপুরি ঠিক নয়। এটা একটা অভূতপূর্ব ব্যাপার ছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু এর আওতাটাও যে ছোট ছিল তাতেও কোনো সন্দেহ নেই।

এই পরিস্থিতিতে উনিশ শতকের পুরোটায় বাংলায় যে-সাহিত্যচর্চা হয় তার প্রধান লক্ষণই ছিল মূলত বাঙালির একটা চলনসই রুচি ও আদর্শ নির্মাণের চেষ্টা। এই রুচি ও আদর্শের নির্মাণটা ওই সময়ের নব্য শিক্ষিত বাঙালির জন্য অত্যন্ত জরুরি ছিল। কারণ সে রুচি ও আদর্শ বলতে ইউরোপের 'উন্নত' রুচি আর আদর্শকেই বুঝত। সে সেই পরিস্থিতির মধ্যেই বেড়ে উঠেছে। এই পরিস্থিতি সম্পর্কে বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছেলে রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর পিতৃস্মৃতি বইয়ে বলেছেন, 'খুব অল্প বয়স থেকেই তখন ইস্কুলে যেতে হত, সেখানে পাঠ্যপুস্তকে ইংলন্ডের ইতিহাস, ইংরেজদের জীবনযাত্রার কাহিনী পড়তে হত, ভারতবর্ষের ইতিবৃত্ত ভারতবর্ষের চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচয়ের কোনো সুযোগ তারা পেত না।' রাজনারায়ণ বসুও তাঁর আত্মজীবনী আত্মচরিত-এ বলেছেন তাঁর কালে হিন্দু কলেজের একটা বড় অংশ শিক্ষার্থী বাংলা পড়তে জানতেন না। এই চৈতন্যের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণিটি নিজেকে নিয়ে ও নিজের চারপাশকে নিয়ে কখনোই সন্তুষ্ট হতে পারেনি। ঔপনিবেশিক বাস্তবতার মধ্যে সেটা সম্ভবও নয়। কারণ, তার আদর্শ তো স্বয়ং ইংরেজ আর তাদের বইপত্রে প্রতিফলিত আরো ইংরেজপনা জীবনবোধ। ব্যাপারটা উনিশ শতকের উপন্যাস দিয়ে ভালো বোঝা যাবে। উনিশ শতকের ঔপন্যাসিকরা অধিকাংশই অতীত ইতিহাসে গিয়েছেন। অতীতের নিরাপদ আড়ালে গিয়ে ওই ইউরোপীয় ছাঁচে গড়া রুচি-আদর্শ আর মন-মনস্বিতা দিয়ে চরিত্রদের গড়িয়ে-পিটিয়ে নির্মাণ করে তুলেছেন। চারপাশের অপ্রস্তুত ও অবিকশিত জনসমাজ নিয়ে নব্য শিক্ষিত লেখক তো 'বিব্রত'। সেই সমাজ নিয়ে তিনি উপন্যাস লিখতে চাননি। যে বা যারা লিখেছেন তাদের উপন্যাস প্রচেষ্টাকে ওই 'উন্নত রুচি'র অনুসন্ধানীরা 'অশ্লীল' বলে খারিজ করে দিয়েছে। প্রসঙ্গত প্যারীচাঁদ মিত্র ও তাঁর *আলালের ঘরের দুলাল* (১৮৫৮) উপন্যাসের কথা উল্লেখ করা যায়। ফলে অন্তত বিশ শতকে প্রবেশের মুখ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্য নরনারীর সম্পর্কের ব্যাপার থেকে শুরু করে ভাষা ও সংস্কৃতি সবকিছুর প্রশ্নেই অতিমাত্রায় আদর্শ-সন্ধানী এবং আরোপণপ্রমুখ। উনিশ শতকের মূল্যবোধ ও সাহিত্যপ্রবণতায় ধাতস্থ রবীন্দ্রনাথ অজস্রধারায় বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। তিনি ছিলেন ওই উনিশ শতকী সাহিত্যিক শ্রেণির সবচেয়ে অগ্রবর্তী ও প্রগতিশীল প্রকাশ। তাঁর মধ্যেও আমরা দেখব সেই ইউরোপের ভিক্টোরীয় মূল্যবোধের প্রকাশ। এই ভিক্টোরীয় মূল্যবোধের সাথে উপনিষদীয় ধর্মবোধের সমন্বয়ে যে-চৈতন্য গঠিত হয়েছিল তা সংগত কারণেই মোটাদাগে ছিল আদর্শায়িত। সাধারণ মানুষের দৃষ্টিকোণের বিচারে তা ছিল অনেক দূর পর্যন্ত আরোপনমূলক। তবু তিনিই ছিলেন উনিশ ও বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের শুরু পর্যন্ত শিক্ষিত বাঙালির একটা বড় অংশের আদর্শ সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের আকর। ইউরোপীয় রুচি-আদর্শের সাথে বৈষ্ণব চৈতন্য ও দেশীয় সংস্কৃতির পরিমার্জিত মিশেলে যে-রবীন্দ্রনাথকে আমরা পাই তা তুলনারহিত। কিন্তু মনে রাখতে হবে এই রবীন্দ্রনাথও শেষ পর্যন্ত পরিচ্ছন্ন আদর্শায়নের এক দুর্লভ সংঘট্ট।

দুই

এই পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটতে শুরু করে বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে। ক্ষেত্রটা অবশ্য তৈরি হচ্ছিল আরো আগে থেকে। বলা যায়, বিশ শতকের শুরু থেকে। বিশ শতকের শুরু থেকে বাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতি ক্রমে ঘোলাটে হতে থাকে। বঙ্গভঙ্গ (১৯০৫) হয়ে যায়। আবার তা রদও (১৯১১) হয়। কংগ্রেসের পাশাপাশি দেখা দেয় নতুন রাজনৈতিক দল মুসলিম লিগ (১৯০৬)। স্বদেশী আন্দোলনের (১৯০৫-১৯১১) ঢেউ জাগে বাংলায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৪-১৯১৯) উত্তাপ কিছুটা হলেও ছড়িয়ে পড়ে সারা পৃথিবীর নানা জায়গার মতো কলকাতায়ও। বড় পৃথিবী তার উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা আর অবক্ষয়সহ কলকাতার কাছাকাছি এসে উত্তপ্ত নিশ্বাস ফেলে। এদিকে আবার ১৯১৯ ও ১৯২০ এ শুরু হয় ইংরেজবিরোধী খেলাফত আন্দোলন (১৯১৯-১৯২৪) ও অসহযোগ আন্দোলন (১৯২০-১৯২২)। রাজনীতির পানি চুঁইয়ে গড়িয়ে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে গ্রাম-গ্রামান্তরের সাধারণ মানুষের মধ্যেও। রাজনীতির সাথে সাধারণ মানুষের সম্পৃক্ততাও আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে বেড়ে যায়। ফলে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের তো বটেই, এমনকি সাধারণ মানুষের চিন্তায় ও রুচিতে একটা ব্যাপক রদবদল ঘটে যায়।

চিন্তা আর রুচির এই পরিবর্তনের চিহ্নগুলো সমকালের সাহিত্যকে একটা ভিন্ন মেজাজ দেয়। দেখা গেল আগের ভাষায় আর চলছে না। কবিতার ছন্দ থেকে শুরু করে পুরো কৃৎকৌশলের ধারণার মধ্যে নতুনত্ব হানা দিল। নতুন জীবনবোধের জন্য এ যেন এক নতুন নন্দনের আবির্ভাব। এই নতুন নন্দনের আবির্ভাবে আগের ভাব, ভাষা, নন্দন পিতৃপুরুষের প্রচেষ্টার সোনালি ফসল হয়েই রয়ে গেল।

তিন

সময়ের এই বদলকে যিনি প্রথম সর্বাত্মকভাবে কবিতায় মূর্ত করতে পেরেছিলেন তিনি কাজী নজরুল ইসলাম। প্রায় সমকালে ও কিছু পরে এই নতুন রুচির পসরা নিয়ে বাংলা সাহিত্যে পঞ্চপাণ্ডবসহ কালি-কলম ও কল্লোল গোষ্ঠীর আরো অনেকে আবির্ভূত হন। এতে করে ওই বিশের দশকেই নতুন নন্দনের সাথে পুরাতন নন্দনের সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এই নতুন প্রজন্মের সাহিত্যিকদের সম্পর্কে বলে উঠলেন, তাদের 'কলমের আব্রু ঘুচে গেছে'। তিনি কিছুতেই এই নতুন প্রজন্মের 'হট্টগোল'কে মানতে পারেননি। নতুন প্রজন্মের হতাশা-নৈরাশ্যের কোনো কারণও তিনি খুঁজে পাননি। তিনি বলেছে, 'হাট নেই কিন্তু হট্টগোল ঠিকই আছে'। রবীন্দ্রনাথ এদের কারো কারো কবিতার ভাষাকে বলেছেন 'জবরদস্তিমূলক'। নজরুল ছিলেন ওই 'বেআব্রু' 'হট্টগোল'প্রবণ প্রজন্মের প্রথম সাহিত্যিক। তিনি কবিতায় বিকট আওয়াজ তুললেন, ধ্বংসামি আনলেন, সাম্রাজ্যবাদী শক্তির শরীরের যেখানে-সেখানে কষে মারতে থাকলেন। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ অগ্নিবীণা (১৯২২) এসবেরই একটা কাব্যিক প্রকাশ। আবার নর-নারীর সম্পর্ক ও রোম্যান্টিক অনুভব অনুভূতি নিয়ে যেসব কবিতা লিখলেন তাও ঠিক আগের সাথে যেন মিলমিশ খেলো না। মানুষী বেদনায় এতটাই অস্থির হয়ে যান যে, সেই বেদনা আর আগের মতো যেন 'মহৎ' বেদনা থাকল না। নারীর প্রতি প্রেমাকাঙ্ক্ষা, ব্যাকুলতা, কাতরতা প্রকাশের ব্যাপারেও যেন আগের সেই রাখঢাক অনেকটাই আর থাকল না। নারী তার শরীরসহ ভারী সাপিনীর মতো নিশ্বাস ছাড়তে লাগল কবিতার পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠায়।

নজরুলের লেখাপত্র আগের একশো-সোয়াশো বছর ধরে গড়ে ওঠা আধুনিক কবিতার ধারণার বেশ বাইরে চলে গেল। আসলে নজরুলের কবিতা গেল বলার চেয়ে বলা ভালো সময়টা বিগত সময়ের ধরনের বাইরে চলে গেল। নজরুল তাঁর কবিতায় সেই বদলের সারসত্যটাকে কয়েন করতে পারলেন। ফলে পুরাতনের সাথে একটা কাব্যতাত্ত্বিক বিরোধ যেন অনিবার্য হয়ে উঠল। এই বিরোধের বিষয়টি বিংশ শতাব্দীর বিশের দশকের প্রায় সব কবি-সাহিত্যিকের আত্মজীবনীমূলক রচনায় পাওয়া যাবে। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায় সজনীকান্ত দাশের আত্মজীবনীমূলক

রচনা 'আত্মস্মৃতি'র কথা। আরো উল্লেখ করা যায় অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'কল্লোলযুগ'।

পুরোনো কবিতার রুচির সাথে নতুন কবিতার বিরোধের বিষয়টি বোঝার জন্য একটি ঘটনারও উল্লেখ করা যায়। ঘটনাটি রবীন্দ্রনাথের বসন্ত (১৩২৯) গ্রন্থটি উৎসর্গের সঙ্গে যুক্ত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর বসন্ত নাটকটি উৎসর্গ করেছিলেন কাজী নজরুল ইসলামকে। রবীন্দ্রনাথের পরিবার বা ব্রাহ্মসমাজের বাইরে এই প্রথম তিনি কাউকে বই উৎসর্গ করেন। নজরুল গবেষক রফিকুল ইসলাম তাঁর 'কাজী নজরুল ইসলাম : জীবন ও সৃজন' গ্রন্থে এর এক মনোজ্ঞ বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি জানাচ্ছেন, নজরুলকে বই উৎসর্গের ব্যাপারটা জানাজানি হতেই রবীন্দ্রনাথের চারপাশের কবি-সাহিত্যিক-অনুরাগীদের মধ্যে একটা যেন রিঁ-রিঁ পড়ে গেল। রবীন্দ্রনাথ সেটা জানতে পেরে একদিন সবার উপস্থিতিতে বললেন, 'নজরুলকে আমি বসন্ত গীতিনাট্য উৎসর্গ করেছি এবং উৎসর্গ পত্রে তাকে 'কবি' বলে অভিহিত করেছি। জানি তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ এটা অনুমোদন করতে পারনি। আমার বিশ্বাস তোমরা নজরুলের কবিতা না পড়েই এই মনোভাব পোষণ করেছ।' রবীন্দ্রনাথের একথা শুনে উপস্থিত একজন সাহিত্যিক, যিনি ওই উনিশ শতকী নন্দনতত্ত্বের ভোক্তা, মন্তব্য করলেন, 'মার মার কাট কাট ও অসির ঝনঝনার মধ্যে রূপ ও রসের প্রলেপটুকু হারিয়ে গেছে।' উদ্ধৃতির শেষাংশ লক্ষ করলে দেখা যাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথের চারপাশের মানুষেরা আসলে পুরোনো নন্দনের বশবর্তী ও ভোক্তা হবার কারণেই নজরুলকে কবি হিসেবে মানতে পারছেন না। আর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে তাঁকে বই উৎসর্গ করলেন, এটা থেকে ভাবার কোনো কারণ নেই যে, তিনি নজরুলের নন্দনের শর্তহীন অনুমোদন করেছেন। মনে রাখতে হবে, এর সাথে ব্যক্তিগত আবেগ যুক্ত, কাব্যতাত্ত্বিক অবস্থান নয়। উৎসর্গটি ছিল নতুন নন্দনের প্রতিনিধিত্বকারী একজন কারাবন্দি কবির প্রতি আরেকজন কবির সহমর্মিতার প্রকাশ। রবীন্দ্রনাথ খুব ভালো করেই জানতেন যে তিনি ভিন্ন নন্দনের মানুষ।

রবীন্দ্রনাথের আশপাশের উনিশ শতকী রুচির কাব্যরসিকরা যে রূপ ও রসের প্রলেপ হারিয়ে যাওয়ার অভিযোগ করেছেন তা নজরুলের কাব্য-কবিতা বিষয়ে কোনো নতুন কথা নয়। এই শ্রেণির কবিতা-ভোক্তা ও সাহিত্যিক বরাবরই নজরুলের 'বিদ্রোহী' ও সমগোত্রীয় নতুন নন্দনের কবিতার বিরুদ্ধে বলেছেন এবং ক্রমাগত লিখেছেন। কারণ, যাকিছু গণমুখী সাহিত্য তাকেই 'বাবু কালচারের' লোকেরা অনেক আগেই ইউরোপীয় 'উন্নত রুচি', 'সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্যের' দোহাই পেড়ে ঝেঁটিয়ে বিদায় করে দিয়েছেন। ফলে নজরুলের রাজনৈতিকতাস্পৃষ্ট গণমুখী (গণমুখী বলছি এজন্য যে, নজরুলের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'অগ্নিবীণা' প্রথম সংস্করণে ছাপা হয়েছিল দুই হাজার কপি। এবং ক্রমাগত প্রতি সংস্করণের দুই হাজার কপি প্রতি এক বছরের মধ্যে নিঃশেষিত হয়েছে। এটি ওই কালে শুধু বিরল নয় অবিশ্বাস্যও ছিল বটে। আর কবিতায় গণ মানুষের চেতনার প্রতিনিধিত্ব করার ব্যাপারটা তো আছেই।) কবিতা উনিশ শতকী বাবু নন্দনের কাছে 'তারস্বর', 'অসংবদ্ধ', 'এলোমেলো', 'অস্থির', 'উন্মাদনা' বলেই সাব্যস্ত হয়েছে। মোহিতলাল মজুমদার 'সাহিত্যের আদর্শ' প্রবন্ধে খুব স্পষ্ট করেই বলেছেন যে, 'আমাদের দেশে খুব বর্তমানকালে এমন একটি প্রবৃত্তি দেখা দিতেছে, যাহাতে সাহিত্যের এই নীতি বা আদর্শ একেবারে উড়িয়া যাইতেছে; অতিশয় অমেধ্য এবং মানবাত্মার পক্ষে গ্লানিকর এই শ্রেণীর ভাব ও ভাবুকতা বিদ্রোহের 'রক্তনিশান' উড়াইয়া ভয়ানক আস্ফালন করিতেছে।' ফলে সজনীকান্ত যখন শনিবারের চিঠিতে নজরুলের কবিতা নিয়ে ব্যাঙ্গের পর ব্যাঙ্গ কবিতা রচনা করতে থাকেন বা রবীন্দ্রনাথ যখন 'কলমের আব্রু ঘোচা'র কথা বলেন তখন তা আসলে ব্যক্তিগত কোনো বিষয় থাকে না। এ আসলে নন্দনতাত্ত্বিক ধারণার ফেরা। অন্য কথায় সময়ের ফেরা মাত্র।

নজরুল নতুন নন্দনের নকিব ছিলেন একথা আগেই বলেছি। তিনি মূলত রাজনৈতিক কবি। কিন্তু লক্ষ করলে দেখা যাবে নজরুল তাঁর কালের যেসব কবি-সাহিত্যিকের সাথে চলাফেরা করতেন তার প্রায় সবাই ছিলেন অরাজনৈতিক। বিশেষত কল্লোল ও কালি-কলম গোষ্ঠীর লেখকরা অধিকাংশই ছিলেন অরাজনৈতিক। এই বিপরীতের সন্নিবেশ কীভাবে ঘটেছিল তা অনুসন্ধান করা দরকার। এই অনুসন্ধানের মধ্যে থেকে বের হয়ে আসতে পারে নতুন নন্দনের ব্যাপারটা।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে কল্লোল, কালি-কলম, প্রগতি পত্রিকা ও কাজী নজরুল ইসলামের সাথে শনিবারের চিঠির একটা বিরোধ ছিল। আসলে এই বিরোধের একটা বড় অংশজুড়ে আছে নন্দনতাত্ত্বিক বিরোধ। যদিও নজরুল এবং কল্লোল, কালি-কলম ও প্রগতির নন্দন এক ছিল না। কিন্তু নতুন কথা নতুনভাবে বলার দিক থেকে নজরুলের সাথে এইসব পত্রিকার ও সমকালের কবি-সাহিত্যিকদের একটা বড় মিল ছিল। এবং তাঁরা নজরুলকে অপ্রথাগতদের শিরোমনি মনে করে যথেষ্ট পাত্তা দিতেন। একারণে নজরুল কল্লোল-এর অন্যতম লেখক ছিলেন। নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতা প্রকাশের পর কল্লোলের লেখকদের দু-একটি মন্তব্য দেখলে বোঝা যেতে পারে তারা কেন নজরুলকে দলে টানতেন। 'বিদ্রোহী' কবিতাটি ছাপা হওয়ার পরের অভিজ্ঞতা বলতে গিয়ে কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র বলেছেন, 'বাংলা সাহিত্যে এই শতাব্দীর [বিংশ শতাব্দী] তৃতীয় দশকের গোড়ায় একবার কিন্তু এমনি অকস্মাৎ তুফানের দুরন্ত দোলা লেগেছিল। ... মনে আছে, বন্ধুবর কবি অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত একটি কাগজ কোথা থেকে কিনে নিয়ে অস্থির উত্তেজনার সঙ্গে আমার ঘরে এসে ঢুকেছিলেন। কাগজটা সামনে মেলে ধরে বলেছিলেন, পড়। অনেক কষ্টে যোগাড় করেছি। রাস্তায় কাড়াকাড়ি পড়ে গেছে এ কাগজ নিয়ে। ... কবিতার নাম 'বিদ্রোহী'। সেদিন ঘরে বাইরে, মাঠে-ঘাটে রাজপথে সভায় এ কবিতা নীরবে নয়, উচ্চকণ্ঠে শত শত পাঠক পড়েছে। সে উত্তেজনা দেখে মনে হয়েছে যে, কবিতার জ্বলন্ত দীপ্তি এমন তীব্র যে ছাপার অক্ষরই যেন কাগজে আগুন ধরিয়ে দেবে। ...গাইবার গান নয়, চীৎকার করে পড়বার এমন কবিতা এ দেশের তরুণরা যেন এই প্রথম হাতে পেয়েছিল। তাদের উদ্দাম হৃদয়ের অস্থিরতারই এ যেন আশ্চর্য প্রতিধ্বনি।' আর অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত বলেছেন, 'এ কে নতুন কবি? নির্জীব দেশে এ কার বীর্যবাণী? শুধু বাংলা সাহিত্যে নয়, সমগ্র দেশ প্রবল নাড়া খেয়ে জেগে উঠল। এমনটি কোনোদিন শুনিনি, ভাবতেও পারিনি। যেন সমস্ত অনুপাতের বাইরে, যেন সমস্ত অঙ্কপাতেরও অতিরিক্ত ...গদগদ বিহ্বলের দেশে এ কে এল উচ্চণ্ড বজ্রনাদ হয়ে। আলস্যে আচ্ছন্ন দেশ আরামের বিছানা ছেড়ে হঠাৎ উদ্দণ্ড মেরুদণ্ডে উঠে দাঁড়াল।' কবিতার বিষয় ও প্রকরণে বিস্তর ভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও এই ভিন্ন স্বর, সুর, নন্দনের সাধনাই তাদের একসাথে গেঁথে রেখেছিল।

কল্লোল ও কালি-কলমগোষ্ঠীর সাথে নজরুলের এই সাযুজ্যের কারণেই সজনীকান্ত দাস রবীন্দ্রনাথের কাছে সমকালীন সাহিত্য নিয়ে যত অভিযোগ-নালিশ করেছেন তার মধ্যে ওইসব পত্রিকার সাথে সাথে সব সময় নজরুলের কবিতার প্রসঙ্গও থাকত। সজনীকান্তদের উপর্যুপরি অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতেই রবীন্দ্রনাথ 'সাহিত্যধর্ম' প্রবন্ধে লিখেছিলেন, 'মত্ততার আত্মবিস্মৃতিতে একরকম উল্লাস হয়; কণ্ঠের অক্লান্ত উত্তেজনায় খুব একটা জোরও আছে, মাধুর্যহীন সেই রূঢ়তাকেই যদি শক্তির লক্ষণ ব'লে মানতে হয় তবে এই পালোয়ানির মাতামাতিকে বাহাদুরি দিতে হবে সে কথা স্বীকার করি।' রবীন্দ্রনাথের এই খোঁচার মাথায় নজরুল যে আছেন তাতে সন্দেহ নেই। বলা বাহুল্য রবীন্দ্রনাথ, মোহিতলাল, সজনীকান্ত ও অপরাপর কবিদের নন্দনতাত্ত্বিক অবস্থানের ওপর ভিত্তি করেই ওই একই নন্দনতত্ত্বের ভোক্তা-সমর্থক-চর্চাকারী কাজী আবদুল ওদুদ নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতা সম্পর্কে বলেছেন, 'বিভিন্ন ভাবের একত্র সমাবেশের সংগতি সুষমা অথবা যৌক্তিকতা বিষয়ে কবি বেশ, উদাসীন হয়েছেন।'

কবিতা কেমন হবে এই নিয়ে বিতর্ক, বাদানুবাদ সাহিত্যের ইতিহাসে নতুন কিছু নয়। এই বাদানুবাদ যত ঘনঘন দেখা দেয় সাহিত্যের জন্য ততই তা সপ্রাণতার লক্ষণ বলেই বিবেচিত হয়। কিন্তু লক্ষণীয় হচ্ছে, নন্দনতাত্ত্বিক বাদানুবাদ কোনো সাহিত্যিকের ইচ্ছা-অনিচ্ছায় ঘটে না। এর সাথে কালের একটা গভীর সম্পর্ক থাকে। কালের পরিবর্তনই আসলে সাহিত্যের নন্দনে কল্লোল তোলে। কালের বড় কবিরা ওই কল্লোলকে অনুবাদ করেন তাঁদের সাহিত্যে। নজরুল তাঁর কালের বড় কবি ছিলেন। তিনি কালকে ধরতে পেরেছিলেন তাঁর কাব্য-কবিতায়। নজরুল তাই তাঁর কালের নতুন নন্দনের নকিব।

কুদরত-ই-হুদা ॥ প্রাবন্ধিক ও গবেষক

সত্যজিৎ রায়ের চলচ্চিত্র দর্শন

নাজিমুদ্দীন শ্যামল

চলচ্চিত্র

সত্যজিৎ রায় বিশ্বচলচ্চিত্রে সর্বকালের সেরা চলচ্চিত্রকারদের মধ্যে অন্যতম একজন। সৌম্যকান্তি এই বাঙালি পুরুষ শুধু সিনেমাতে নয়, বরং লেখালেখি, চিত্রশিল্প, সঙ্গীত সৃষ্টিসহ আধুনিক শিল্পকলার নানা শাখায় বিপুল অবদানের মাধ্যমে জীবদ্দশাতেই কিংবদন্তিতে রূপান্তরিত হয়েছিলেন। তাঁর স্পর্শেই রাতারাতি বদলে গিয়েছিল বাংলা সিনেমার ইতিহাস, সমৃদ্ধ হয়েছিল নতুন চলচ্চিত্রের ভান্ডার, নির্মিত হয়েছিল নতুন চলচ্চিত্র দর্শন। সত্যজিতের আগে আর কে এমন, যিনি বিশ্বময় বাঙালিকে এমন সম্মানের উঁচু আসনে নিয়ে যেতে পেরেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ ছাড়া।

সত্যজিৎ রায় জন্মেছিলেন বাংলার বিখ্যাত রায় পরিবারে ১৯২১ সালের ২ মে। তাঁর পিতা সুকুমার রায় ছিলেন চিত্রকর, লেখক ও বাঙালি মনীষা। তাঁর পিতামহ উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীও ছিলেন লেখক, দার্শনিক, সঙ্গীতজ্ঞ ও চিত্রশিল্পী। ফলে বংশগত ও জন্মগতভাবে তাঁর মাঝে শিল্পসত্ত্বা থাকবে এটাই স্বাভাবিক

এবং উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী থেকে সুকুমার রায় হয়ে সত্যজিতের মধ্য দিয়ে তার তিন পুরুষের কিংবা বংশের শিল্প সাধনা পূর্ণতা লাভ করেছিল। কিন্তু এই কথা সত্য যে, বালকবেলায় পিতার মৃত্যু তাঁর পথ চলাকে কঠিন করে দিলেও, তাঁর মা সুপ্রভা দেবীর দৃঢ়তা ও কঠিন সংগ্রাম সত্যজিৎ রায়কে জ্ঞান, ব্যক্তিত্ব, মনন, দৃঢ়তা ও সাহস অর্জনে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। তাঁর শিক্ষাজীবন তথা জীবনের চলার পথ থেমে যেতে পারতো তাঁর পিতার মৃত্যুতে। কিন্তু তাঁর মায়ের লড়াই তাঁকে জীবনের বন্ধুর পথে সাহসী সংগ্রামী লড়াকু করে গড়ে তুলেছিল। পরবর্তীকালে আমরা সেই দৃঢ়তা তাঁর চলচ্চিত্র জীবনে ও শিল্প সংগ্রামে এবং অবশ্যই তাঁর সৃষ্ঠ সকল শিল্পে তা প্রত্যক্ষ করেছি।

চল্লিশের দশকে সত্যজিৎ রায় চিদানন্দ দাশগুপ্তসহ অন্যান্যদের নিয়ে চলচ্চিত্র সংসদ-আন্দোলন শুরু করেছিলেন। ১৯৪৭ সালে কলকাতা ফিল্ম সোসাইটি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বিশ্বের আধুনিকতম শিল্পমাধ্যম চলচ্চিত্রের শিক্ষা ও চর্চার ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেন। ১৯৪৯ সালে বিশ্বখ্যাত ফরাসি চলচ্চিত্রকার জাঁ রেনোয়া তাঁর বিখ্যাত জরাবৎ ছবি নির্মাণের জন্য কলকাতা আসেন এবং এই সময় সত্যজিৎ রেনোয়াকে লোকেশন নির্বাচন ও শ্যুটিং এ সহযোগিতা করেছিলেন। এটি তাঁকে এতটাই প্রভাবিত করেছিল যে, তিনি সিনেমা নির্মাণে বদ্ধ পরিকর হয়ে উঠেছিলেন। এই বছরই তাঁর জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা ঘটেছিল। তিনি এ বছর বিজয়া রায়ের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। এখানে উল্লেখ্য যে, বিজয়া তাঁর মামাত বোন ছিলেন এবং এই বিবাহ প্রচলিত ধর্ম-সংস্কারের বিপক্ষে তুমুল এক বিদ্রোহও ছিলেন।

১৯৫০ সালে তিনি লন্ডন যান এবং সেখানে প্রচুর ছবি (৯৯টি) দেখেন তাঁর ছয়মাস অবস্থানকালীন সময়ে। তিনি ভিত্তরিও ডিসিকার বাইসাইকেল থিভস ছবিটি দেখে অন্য আবেগে উদ্বেলিত হন এবং নিজে ছবি নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। অর্থাৎ, তিনি একটি বা অনেকগুলো ধ্রুপদী চলচ্চিত্র দর্শন অধ্যয়ন শেষে নিশ্চিত হতে পেরেছিলেন যে, তিনি চলচ্চিত্র নির্মাণ করবেন। তাছাড়া কলকাতা চলচ্চিত্র সংসদে তাঁর চলচ্চিত্রের চর্চা ও অধ্যয়ন অনেকের তুলনায় অগ্রগামী ও নিবিড় ছিল। এটিও তাঁকে চলচ্চিত্র নির্মাণে ব্রতী করেছিল নিঃসন্দেহে। ১৯৫২ সালে তিনি বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী' নির্মাণ কাজ শুরু করেছিলেন। ১৯৫৫ সালে নানা চড়াই উৎরাইয়ের মধ্য দিয়ে তিনি এই ছবির নির্মাণ সম্পন্ন করেন।

১৯৫২ থেকে ১৯৯২, চার দশকের চলচ্চিত্র জীবনে তিনি ৩৬টি চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছিলেন। এর মধ্যে ২৯টি পূর্ণাঙ্গ কাহিনিচিত্র, ৫টি প্রামাণ্যচিত্র ও ২টি স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র। তিনি তাঁর চলচ্চিত্র জীবনে চলচ্চিত্র পরিচালনা, সঙ্গীত পরিচালনা, চিত্রনাট্য রচনাসহ প্রায় সব কাজ অত্যন্ত পারদর্শিতার সঙ্গে সম্পন্ন করেন। একটি ছবি রচনা বা নির্মাণের ক্ষেত্রে তিনি একজন পূর্ণাঙ্গ পরিচালক (Total Director) ছিলেন।

তাঁর ৩৬টি চলচ্চিত্রের মধ্যে অপু ট্রিলজি ('পথের পাঁচালী', অপরাজিতা ও অপুর সংসার) সর্বকালের সেরা শত চলচ্চিত্রের তালিকায় স্থান করে নিয়েছে। এটি বাংলা সিনেমা ও ভারতীয় সিনেমার জন্য সত্যিকার অর্থেই গর্বের বিষয়। এই ক্ষেত্রে একটি কথা উল্লেখ করতেই হয় যে, সত্যজিতের 'পথের পাঁচালী' বাংলা সিনেমাকেই শুধু নয়, ভারতীয় সিনেমাকে এক নতুন পৃথিবীর দুয়ার খুলে দিয়েছিল। সিনেমা যে এতটা জীবন ঘনিষ্ঠ শিল্প হতে পারে, সত্যজিতের 'পথের পাঁচালী'র আগে বাংলা তথা ভারতীয় চলচ্চিত্রে কেউ নির্ণয় করতে পারেননি। এই ছবিতে যেমন শিকড় চিনে নেয়ার একটি ব্যাপার রয়েছে তেমনি রয়েছে জীবনের ভিতর লুকিয়ে থাকা অপ্রকাশিত রাজনীতি ও সংগ্রামের অকপট সত্য সরল শিল্পীত প্রকাশ। এটাকেই হয়তো-বা ধ্রুপদী চলচ্চিত্রের উচ্চতর উদাহরণ হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। চলচ্চিত্র সমালোচক রজার এলবার্টের মতে, 'এটি আমাদের থেকে অনেক দূরে সরে যাওয়া সময়, স্থান, এবং সংস্কৃতির প্রকাশ করে। এটি আমাদের মানবিক অনুভূতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও গভীর সংযোগ নির্মাণ করে। এটি প্রার্থনার মতো...' এই ক্ষেত্রে আরো উল্লেখ করতে চাই যে, 'পথের পাঁচালী' ১৯৫৬ সালে কান চলচ্চিত্র উৎসবে 'শ্রেষ্ঠ মানব দলিল' হিসেবে পুরস্কৃত হয়েছিল।

বরেণ্য চলচ্চিত্র গবেষক ফাদার গাস্তঁ রোবের্জ বলেছেন, সত্যজিতের ছবি সম্বন্ধে যেকোনো মানুষের প্রতিক্রিয়ানির্ভর করে সেই মানুষটির মানবতাবাদ সম্পর্কিত নিজস্ব ধারণার ওপর। এবং বর্তমানে কোনো মানুষের মানবতাবাদ সম্পর্কিত ধারণা আর স্বতঃস্ফূর্ত থাকতে পারে না (যদি তা আদৌ থাকে)।

মানুষকে মানুষের কাছে দায়বদ্ধ থাকতে হবে এবং দায়বদ্ধ থাকতে হলে কতগুলো নির্দিষ্ট পথের ওপর নির্ভরশীল হতে হবে। ভাববাদী মানবতাবাদকে শিল্পসম্মত করে তোলা এবং মেকি বস্তুবাদী মানবতাবাদকে সমাজতান্ত্রিক সমর্থন দেবার প্রয়াস দুটির মধ্যে যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব তার মীমাংসা হবার সম্ভাবনা খুব কম। এবং সত্যজিৎ রায়ের কৃতিত্ব হলো দেশের সন্ত্রাসমূলক আদর্শের চাপের বিরুদ্ধে ও বিদেশের প্রলুব্ধকর, সহজলভ্য বিপুল খ্যাতির জন্য প্রলুব্ধ না হয়ে বারবার তিনি নতুন করে নিজের মানবতাবাদকে ছবির মাধ্যমে তুলে ধরেছেন।'

এই কথাও অবশ্যই উল্লেখ্য যে সত্যজিৎ রায় পারিবারিক ও সাংস্কৃতিকভাবে যে ধারাবাহিক কালচারাল প্ল্যাটফর্মে গড়ে উঠেছিলেন, তাতে করে তাঁর বোধ, বিশ্বাস, শিল্পচেতনা ও মানবতাবোধ আর রাজনীতির দর্শন গভীর শিকড়ে প্রোথিত ছিল। তা ছিল অনড় ও দৃঢ়। ফলে তাঁর সিনেমায় মানবতার চিত্রায়ণ করতে গিয়ে তিনি মানুষের ভিতরকার অপ্রকাশিত রাজনীতি, বেদনা আর সংগ্রামকে নির্ণয় করেছেন ধ্রুপদী আঙ্গিকে।

তাঁর বেশিরভাগ ছবির অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, 'বিশেষজ্ঞরা বলবেন সত্যজিতের বাকী সব ছবি 'পথের পাঁচালী' থেকে টেকনিক্যালি সুপিরিয়র, তাঁর হাত পরবর্তীতে প্রত্যেক ছবিতে দক্ষ হয়েছে কিন্তু 'পথের পাঁচালী'র ভাইটালিটি, 'পথের পাঁচালী'র তীব্রতা, তার Identity মনে হয় যেন, একটা ঈগল এসে দর্শকের হৃদয়টাকে ছোঁ মেরে আকাশে নিয়ে উড়ে গেলো।' সৌমিত্রের এই কথা শুধু 'পথের পাঁচালী'র জন্য নয়। অন্যসব ছবির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। সত্যজিতের প্রতিটি নতুন ছবি এক নতুন বোধন ও চেতনার উন্মোচন করেছে। 'হীরক রাজার দেশে' মনে হবে শিশুতোষ চলচ্চিত্র। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই চলচ্চিত্রটি সর্বকালের জন্য অনন্য একটি রাজনৈতিক চলচ্চিত্র হিসেবে প্রতিফলিত হয়েছে। এত বছর পরেও দেশে দেশে স্বৈরশাসকের উৎখাতের আন্দোলনে এক সঞ্জীবনী চলচ্চিত্র হিসেবে ভূমিকা রেখে যাচ্ছে। এটা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে সত্যজিৎ রায়ের তাঁর চলচ্চিত্রসমূহে গভীরভাবে মানবজীবনকে বিনির্মাণ করতে গিয়ে জীবনের দুঃখ বেদনা, হতাশা স্বপ্নের পাশাপাশি তাঁর অভ্যন্তরে যে রাজনীতির সংঘাত রয়েছে তা প্রতিটি সিনেমাতেই মৌলিকভাবে নির্ণিত ও নির্মিত হয়েছে।

তাঁর চলচ্চিত্রের অভিনয় শিল্পীরা কখনো উচ্চকিত নন। এদের মধ্যে কোনো আতিশয্য নাই। মনে হয় জীবনের অকপট বহমান ও প্রকৃত টুকরোগুলো সেলুলয়েডে এনে বসিয়ে দিয়েছেন সত্যজিৎ রায়। নিও রিয়েলিজমের এমন ব্যাপক সফলতা সত্যজিৎ রায় ছাড়া আর কোনো বাঙালি বা ভারতীয় চলচ্চিত্রকারের হাত দিয়ে বাস্তবায়িত হয়নি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'নষ্টনীড়' অবলম্বনে সত্যজিৎ রায়ের চারুলতা তাঁর প্রিয় চলচ্চিত্র। তিনি চলচ্চিত্রটি নির্মাণ করে সম্ভবত খুশি হয়েছিলেন। তাঁকে প্রশ্ন করা হলে তিনি উত্তর দিয়েছিলেন যে, 'চারুলতা' যদি আবারো নির্মাণ করতে বলে কেউ তবে তিনি একইভাবে একই চলচ্চিত্র নির্মাণ করবেন। অথচ, 'নায়ক' যে ছবিটি কিনা উত্তম কুমারের জীবনের ছায়া অবলম্বনে নির্মিত এবং বার্লিন উৎসবে ক্রিটিক এওয়ার্ডসহ অনেক পুরস্কারপ্রাপ্ত ছবি তাঁর অনেক ত্রুটি থাকতে পারে, কিন্তু উত্তমের অভিনয়ের কোনো ত্রুটি ছিল না।

অপুট্রিলজির পরে সত্যজিৎ রায় কলকাতা ট্রিলজি (প্রতিদ্বন্দ্বী ১৯৭০, সীমাবদ্ধ ১৯৭১ ও জন অরণ্য ১৯৭৫) নির্মাণ করেছিলেন। অপু ট্রিলজি যেমন ট্রিলজি হিসেবে পরিকল্পিতভাবে নির্মাণ করেননি, তেমনি, কলকাতা ট্রিলজিও পরিকল্পিতভাবে নির্মাণ করা হয়নি। তিনটি ছবি পৃথক সময়ে নির্মিত হলেও বিষয়, আঙ্গিক ও প্রতিপাদ্যের কারণে ছবিগুলো ট্রিলজি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। কলকাতা ট্রিলজিতে সত্তরের দশকের সংকুল বাঙালি জীবনকে সত্যজিৎ রায় এক নির্মোহ-বিবেচনায় সেলুলয়েডে ধারণ করেছেন। অপু ট্রিলজিতে যেমন বাঙালির ফেলে আসা যাপিত জীবনকে দারিদ্র্য, রাজনীতি আর স্বপ্ন বুননের প্রেক্ষাপটে আবিষ্কার করেছিলেন, তেমনি কলকাতা ট্রিলজিতে তাঁর দেখা সময় অর্থাৎ সত্তরের দশকের সংগ্রাম, স্বপ্ন, স্খলন, বিচ্ছিন্নতা ও নিরবচ্ছিন্নতা ইত্যাকার বিষয়াদির দ্বন্দ্ব ও বিস্তারের মাধ্যমে শুধু সময়, বিষণ্নতা ও জীবনকেই রূপায়িত করেননি, বরং

সত্যজিৎ রায়

বাংলা সিনেমার বিশেষত রাজনৈতিক সিনেমার ক্ষেত্রে এক অবিস্মরণীয় অধ্যায় সংযোজন করেছেন।

সত্যজিতের চলচ্চিত্রগুলো নির্মিতির ক্ষেত্রে অসাধারণ পরিকল্পনা, প্রস্তুতি ও দৃঢ়তা ছিল। ফলে তাঁর চলচ্চিত্রের প্রতিটি ফ্রেম যেন ধ্রুপদী দক্ষতায় চিত্রায়িত হয়েছে। পরিকল্পিতভাবে ফ্রেম থেকে ফ্রেমের সংযোজনের ফলে চলচ্চিত্রসমূহ আঙ্গিকও চলচ্চিত্রভাষার ক্ষেত্রে একেবারে নির্ভুল ও ব্যাকরণসম্মত বলা চলে। তাছাড়াও চলচ্চিত্রের চলমানতায় গল্পগুলোও যেন ধীরে ধীরে পরিষ্কার হয়ে ওঠে। গল্পের সঙ্গে সঙ্গে চলচ্চিত্রের সঙ্গীত অপূর্ব মন্তাজে ধীরলয়ের এসব সিনেমাকে অনন্য এক চিত্রগতি প্রদান করে থাকে। ফলে গল্প, চলচ্চিত্র এবং চলচ্চিত্রের সঙ্গীতের অনন্য এক সংযোজনে দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে অথবা একটি চলচ্চিত্র থেকে পরবর্তী চলচ্চিত্রে চিত্রভাষা ও চলচ্চিত্র দর্শনের তৃতীয় এক মাত্রা আমার কাছে প্রতীয়মান হয়েছে। তাঁর সিনেমাসমূহ অর্থের চেয়ে বেশি অর্থবহ কিংবা ক্লাসিকের মধ্যেও চূড়ান্ত ক্লাসিক। তাঁর চলচ্চিত্রসমূহ ধীর, শান্ত, তীব্র ও অতি সম্মোহক। এখানে প্রশ্ন হলো সত্যজিতের এত ধীরলয়ের সিনেমাগুলো কীভাবে এত তীব্র হয়। এত শান্ত বিষয়াদির ভিতরে গূঢ়তর সত্যের উন্মোচনে কিভাবে এত সম্মোহক হয়। বিষয়টি নির্ণয়ের জন্য তাঁর যেকোনো চলচ্চিত্রের অধ্যয়ন করলে এটা পরিষ্কার হয়ে যাবে যে, অত্যন্ত সাদামাটা অকপট সরল বুনটে তাঁর ছবি সত্যের অধিক সত্য, রাজনীতির অধিক রাজনীতি, মানবিকতার চেয়েও বেশি মানবতাবোধ চিত্রায়ণ করেছে। তাঁর ছবিতে সরল রৈখিক জীবন চিত্রায়ণ করতে গিয়ে তিনি জীবনের অধিক জীবন এবং তীব্র জীবন দর্শন আমাদের কাছে উপস্থাপন করেছেন। এটি নিশ্চয়ই তাঁর চলচ্চিত্রের অনন্যতা।

আবার আরেকটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য যে, সত্যজিৎ রায় তাঁর ছবিগুলোতে নারী চরিত্রগুলোকে এমন ব্যাপক ও বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেছেন যে, তাঁর ছবির নারী চরিত্রগুলো একত্রিত হয়ে ভারতীয় এবং বাঙালি নারীদের জীবন বেদনা ও জীবনাচরণকে গভীরতরভাবে চিত্রায়িত হয়েছে। ভারতীয় নারীত্ববোধকে বোধ করি সত্যজিৎ রায়ের মতো এমন বিস্তারিতভাবে এবং গভীরতর বিশ্লেষণ এর মাধ্যমে আর কোনো চলচ্চিত্রকার নির্মাণ করতে পারেননি। তিনি তাঁর নারী চরিত্রগুলোকে চিত্রায়ণ করতে গিয়ে নারীবাদের কথা প্রকটভাবে না বললেও নারীদের জীবন সংগ্রাম প্রচণ্ড তীব্রতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন। ভারতীয় নারীদের সংস্কার, যৌনতার বোধ, প্রেমের অন্তর্মুখীনতা অবদমন ও তাদের ওপর সংঘটিত শোষণসহ ইত্যাকার বিষয়াদি সত্যজিৎ রায় তাঁর চলচ্চিত্রে এমন বিশদভাবে চিত্রায়ণ করেছেন যে, কোনো দর্শক সহজেই নারীত্বের পূর্ণ প্রতিমা অবলোকন করতে সক্ষম হবেন। এই ক্ষেত্রে আমার মনে হয়, শৈশবে পিতৃহারা সত্যজিৎ রায় সারা জীবনই তাঁর মায়ের জীবনের সংগ্রাম ও বেদনা অবলোকন করেছেন। আর এসব বোধ তাঁর সিনেমাতে প্রকটিত হয়েছে। মানবতাবোধ তাঁর ছবির ফ্রেমে ফ্রেমে তা বিস্তার লাভ করেছে।

সাহিত্যের চিত্রায়ণের ক্ষেত্রে সত্যজিৎ রায় নতুন এক দিগন্তের উন্মোচন করেছেন। তিনি মনে করতেন, সিনেমাতে গল্পের কাঠামোটা মজবুত হতে হবে। তবেই তা সিনেমাটিকভাবে বলা যাবে। সত্যিকার অর্থে তিনি যখন সাহিত্যের চলচ্চিত্রায়ণ করেছেন, তাতে তিনি এমন এক উৎকর্ষ সাধন করতে সমর্থ হয়েছেন যে; তার ছবি মূল সাহিত্যের মধ্যে থেকেও স্বতন্ত্র ও মৌলিক রূপ ধারণ করেছে। সেটা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনার চলচ্চিত্রায়ণের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি সত্যজিৎ রায় মূল সাহিত্য কর্মের অনুগামী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর চলচ্চিত্র ভিন্নতর এক মাত্রায় মৌলিক ও অনন্য হয়েছে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে তো মনে হয়েছে যে, মূল সাহিত্যকর্মগুলোই সত্যজিৎ রায়ের চলচ্চিত্রকে অনুসরণ করেছে। সাহিত্যে যতটা না ডিটেল ও গভীরভাবে বিষয় ও ঘটনা তুলে ধরা হয়েছে, সত্যজিৎ রায় তাঁর সিনেমাতে আরো বেশি বিস্তারিত ও গভীরতরভাবে এসব বিষয় নির্মাণ করেছেন। মনে হয়েছে মূল সাহিত্যে অনেক খুঁটিনাটি বিষয় বর্ণনা করা হয়নি। অথচ, সত্যজিৎ রায় তাঁর সিনেমাতে এসব খুঁটিনাটি বিষয় এমন ধারাবাহিকভাবে বিনির্মাণ করেছেন যে, তাঁর সিনেমার মৌলিকতা ও স্বাতন্ত্র্য চিরস্মরণীয় ও অনুকরণীয় হয়ে থাকবে। আমরা দেখতে পাই, সাহিত্য থেকে চলচ্চিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে অনেক চলচ্চিত্রকার সাহিত্যের আবহে ঘুরপাক খেতে থাকেন। ফলে নির্মিত চলচ্চিত্রটি কোনোভাবেই মূল সাহিত্য অর্থাৎ উপন্যাস বা গল্পকে ছাড়িয়ে যেতে পারে না। কিন্তু সত্যজিৎ রায় সেক্ষেত্রে অনন্য ব্যতিক্রমই শুধু নন, মৌলিকতা এক অসাধারণ উদাহরণ। আমরা যদি তাঁর রবীন্দ্রসাহিত্যের চলচ্চিত্রায়ণগুলোকে বিবেচনা করি, বিশেষত চারুলতা কিংবা ঘরে বাইরের কথাও চিন্তা করি তবে এটি স্পষ্টত প্রতীয়মান হবে যে, সত্যজিৎ রায় তাঁর চলচ্চিত্রগুলোতে সত্যি সত্যিই রবীন্দ্রনাথকে অতিক্রম করেছেন। নিশ্চয়ই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নষ্টনীড়, ঘরে বাইরে, পোস্টমাস্টার, মণিহারা, সমাপ্তি (সত্যজিতের তিনকন্যা) ইত্যাদি ধ্রুপদী সাহিত্য ও বিশ্বসাহিত্যের মানদণ্ডে অবশ্যই অগ্রগণ্য। কিন্তু এসবকে অবলম্বন করে সত্যজিৎ রায়ের চলচ্চিত্রগুলো বিশ্বচলচ্চিত্রের মানদণ্ডে সর্বকালের ধ্রুপদী ও সেরা সিনেমাগুলোর অন্যতম। বিশেষত চারুলতা ছবির প্রতিটি ফ্রেমে যে ক্লাসিক চলচ্চিত্র বিজ্ঞান লুকিয়ে আছে তাঁর সঙ্গে শুধু বিশ্বের সর্বকালের সেরা সিনেমাগুলোর ধ্রুপদ আঙ্গিকে তুল্য হতে পারে। সত্যজিৎ রায় চারুলতা সম্পর্কিত এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, তাঁকে যদি আবার তাঁর ছবিগুলো নির্মাণ করতে বলেন, তবে হয়তো নতুনভাবে নির্মাণের ক্ষেত্রে অন্যান্য ছবিগুলোকে তাঁর মনমতো ত্রুটিমুক্ত করবেন। কিন্তু শুধু চারুলতা তিনি হুবহু একইভাবে বিনির্মাণ করবেন। এই ছবির প্রতিটি ফ্রেমই শৈল্পিক ও ধ্রুপদী।

সত্যজিৎ রায়ের নিজস্ব গল্পে নির্মিত ছবি কাঞ্চনজঙ্গা। এই ছবিতে তিনি প্রকৃতিকে অসাধারণ দক্ষতায় মানবিক দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের সঙ্গে মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন। এই ছবিটি হলিউডের চলচ্চিত্র ব্যাকরণের শুধু সার্থক প্রয়োগই নয় বরং হলিউডের চলচ্চিত্রবিজ্ঞানে নতুন উত্তরণও বটে। অত্যন্ত সীমিত কারিগরি যন্ত্রপাতি নিয়ে তিনি যেভাবে কুয়াশার প্রকৃতিতে

পুরো চলচ্চিত্রটি নির্মাণ করেছেন, তা Under tone Making এর ক্ষেত্রে অসাধারণ এক উদাহরণ। এশিয়ার আরেক বিখ্যাত চলচ্চিত্রকার আকিরা কুরোশাওয়া ছবিটি দেখে বিমোহিত হয়েছিলেন, বিভিন্ন চলচ্চিত্র সমালোচক ছবিটিকে কোমল, শান্ত চলচ্চিত্র হিসেবে অভিহিত করেছিলেন। কিন্তু সত্যিকার অর্থেই এ ছবি স্বতঃস্ফূর্ত ও ধারাবাহিক দৃশ্যায়নের ক্ষেত্রে অসাধারণ উদাহরণ। এই ছবির দৃশ্যগুলো এতটা সাবলীলভাবে পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়েছে যেন-বা প্রকৃতির নিরন্তর ধারাবাহিকতাই অক্ষুণ্ন রয়েছে। এটা সত্যজিৎ রায়ের স্বাতন্ত্র্য। তাঁর প্রতিটি ছবিতে কোনো না কোনো পৃথক বৈশিষ্ট্য ও স্বকীয়তা ছবিকে ঋদ্ধ করে থাকে।

বিশ্ববরেণ্য চলচ্চিত্রকার আকিরা কুরোশাওয়া বলেছিলেন, সত্যজিৎ রায়ের চলচ্চিত্র না দেখা মানে চন্দ্র সূর্য না দেখা। এটা সত্যি যে, বিশ্বচলচ্চিত্রে সত্যজিৎ রায়ের চলচ্চিত্র সূর্যের আলোর মতো দ্যুতি ছড়াচ্ছে। দিনে দিনে এই আলো আরো উজ্জ্বলতর হচ্ছে। তাঁর ছবি আমাদের অর্থাৎ দর্শকদের এমনভাবে আপ্লুত করে যে, এক অলৌকিক অনুভূতি তৈরি হয় মনের মধ্যে। এই অনুভূতি মানবিকতার, এই অনুভূতি যাপিত জীবনের অনাবিল আনন্দের। তাঁর সিনেমার ঘরানায় যেমন কাব্যময়তা আছে, তেমনি গণ ইতিহাস ও গণমানুষের যাপিত জীবনের উপাত্ত সম্বলিত প্রবন্ধের মতোন তত্ত্বও রয়েছে।

তাঁর গুপী গাইন বাঘা বাইন বা হীরক রাজার দেশে ছবিগুলো সময়কে ধারণ করে সময়কে অতিক্রম করার এক অনন্য উদাহরণ। এইসব ছবির রূপক ও উপমা পৃথিবীর রাজনৈতিক সংকটে চিরকালের একটি আসন অর্জন করেছে। তাঁর সর্বশেষ ছবি আগন্তুক (১৯৯১) একটি চেম্বার ফিল্ম। এই ছবিতে তিনি তাঁর জীবনের ও শিল্পের দর্শন তুলে ধরেছেন। একজন মানুষ মানবিকতায় ও স্বপ্নে কতবড় হওয়া উচিত তাঁর অসাধারণ এক চরিত্র তিনি এই পৃথিবীতে নির্মাণ করেছেন। বামন মানুষের এই পৃথিবীতে শালপ্রাংশু মানুষের কতো অভাব ও প্রয়োজন তা তিনি শৈল্পিক কুশলতায় নির্মাণ করেছেন, এ যেন তাঁর যাপিত জীবনের বোধন ও স্বপ্নের কথা উত্তর প্রজন্মের জন্য চলচ্চিত্র ভাষায় বলে যাওয়া এক মহাকবিতা। তিনি এই পৃথিবীতে একজন আগন্তুক ও জীবনের পথে পথে স্বপ্ন ও মানবিকতার বীজ বুনে চলে গেলেন। আগন্তুক ছবি দেখে আমাদের এরকম মনে হয়।

চলচ্চিত্রে সত্যজিৎ রায় পরিচালনা, সম্পাদনা, চিত্রনাট্য রচনা, ক্যামেরা পরিচালনা, চরিত্রায়ণ, সঙ্গীত-রচনা, স্বরলিপি রচনা, শিল্প নির্দেশনা, শিল্পী কুশলীদের নাম-তালিকার নকশা, বিজ্ঞাপন ডিজাইন ইত্যাকার সকল কাজে-কিংবদন্তিতুল্য পারদর্শী হয়ে উঠেছিলেন। ফলে তিনি 'টোটাল ফিল্ম মেকার' বলতে যা বোঝায় তাই ছিলেন। সত্যজিৎ রায়ের মতো Total Film Maker বিশ্বচলচ্চিত্রে একেবারেই বিরল। তাছাড়াও তিনি ছিলেন একজন চিত্রকর, লেখক, চলচ্চিত্র সমালোচক ও গবেষক। শিল্পী হিসেবে বিভিন্ন মাধ্যম ও বিষয়াদিতে পারঙ্গম হওয়ার কারণে তাঁর ছবিতে শিল্প ও বিজ্ঞানের যুগলবন্দি যেমন অসাধারণভাবে ফুটে উঠেছে; তেমনি তাঁর ছবির প্রতিটি ক্ষেত্রে অনন্য এক পরিমিতি বোধ আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়।

আমাদের মনে রাখা দরকার যে, বাঙালির জীবনে ও সংস্কৃতিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সত্যজিৎ রায় এক স্থায়ী আসন পেতে বসে আছেন। রবীন্দ্রনাথের গল্প বা উপন্যাস প্রথমবার পড়লে যে অনুভূতি বা বোধ তৈরি হয়, দ্বিতীয়বার পড়লে তার থেকে ভিন্ন বোধ বা অর্থ তৈরি হয়। আবার তৃতীয়বার পড়লে আরো নতুন অর্থ বা দ্যোতনা তৈরি হয়। অর্থাৎ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গল্প উপন্যাস প্রতিবারই নতুন নতুন অর্থ ও ব্যাখ্যা নিয়ে পাঠকের সামনে উপস্থিত হয়। এর এক ধরনের চিরকালীনত্য বা নতুনতা রয়েছে। অনুরূপভাবে সত্যজিৎ রায়ের সিনেমাগুলো যতবারই একজন দর্শক দেখবে, ততবারই নতুন অভিজ্ঞানে ঋদ্ধ হবেন। আমি প্রথমবার যখন 'পথের পাঁচালী' দেখি তখন বোধ হয়েছে এটি প্রকৃতির এক অপরূপ চিত্রায়ণ জীবনের এক অকপট বর্ণনা। পরের বার যখন দেখি তখন বোধ হলো এটি বিভূতিভূষণের উপন্যাসের তুলনায় আরো অধিক এক মানবিক দলিল। সম্প্রতি দেখার পর বোধ হলো এটা আসলে বাঙালির জীবন সংগ্রাম ও রাজনীতির জীবন সংগ্রাম ও রাজনীতির এক উচ্চমার্গীয় ধ্রুপদী চিত্রায়ণ শুধু নয়, সারা পৃথিবীর Potitical Film এর ইতিহাসে নতুন ধারার সূচনা। এখানে সারা পৃথিবীর এর ইতিহাসে নতুন ধারার সূচনা। এখানে কোনো স্লোগান নেই, কোনো ফল নেই। আছে কেবল

সত্যজিৎ রায়ের 'সিকিম' চলচ্চিত্রটি রাজতন্ত্র ও সামন্তবাদের বিরুদ্ধে তীব্র এক প্রতিবাদ। সিকিমের রাজা চোগিয়াল ও তাঁর আমেরিকান স্ত্রী হোপ কুকের অনুরোধে তিনি ছবিটি নির্মাণ করেছিলেন। তাঁরা বিশ্ববিখ্যাত চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায়কে অনুরোধ করেছিলেন সিকিমের ওপর ছবি করতে

বেঁচে থাকার লড়াই, অর্থনীতির মারপ্যাঁচ। এর থেকে বড় রাজনৈতিক ছবি পৃথিবীতে আর কি হতে পারে।

আবার 'নায়ক' সিনেমাটি দেখার সময় একবার মনে হলো এটি উত্তম কুমারের জীবনচিত্র, আবার মনে হলো সত্যজিৎ রায় তাঁর শিল্পী জীবনের অনেক অজানা সংগ্রামের কথা বলেছেন। আরেকবার মনে হলো বাংলা সিনেমা আর সিনেমার কুশীলবদের জীবন সংগ্রাম, সিনেমা ও শিল্পের রাজনীতি সবকিছু অসাধারণ কুশলতায় তিনি তুলে ধরেছেন।

বস্তুত তিনি রাজনৈতিক ছবির ঘরানা ভেঙে তাঁর ছবিগুলোতে নতুন এক ঘরানা তৈরি করেছেন। যে ঘরানায় স্লোগান দিতে হয় না, দল করতে হয় না, জীবনের ভিতরে লুকিয়ে থাকা রাজনীতি ও তাঁর বীভৎসতাকে এমন মানবিকভাবে আর কে তুলে ধরতে পেরেছেন, একমাত্র সত্যজিৎ রায়ের সিনেমা তীব্র মানবিক, রাজনৈতিক ও জীবনমুখী।

সত্যজিৎ রায়ের 'সিকিম' চলচ্চিত্রটি রাজতন্ত্র ও সামন্তবাদের বিরুদ্ধে তীব্র এক প্রতিবাদ। সিকিমের রাজা চোগিয়াল ও তাঁর আমেরিকান স্ত্রী হোপ কুকের অনুরোধে তিনি ছবিটি নির্মাণ করেছিলেন। তাঁরা বিশ্ববিখ্যাত চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায়কে অনুরোধ করেছিলেন সিকিমের ওপর ছবি করতে। রাজা ও রানি সত্যজিৎকে ছবি তৈরির ব্যাপারে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁরা ঘূণাক্ষরেও বুঝতে পারেননি যে, সত্যজিৎ রায় তাঁর ছোট্ট ডকুমেন্টারি ছবিটিতে বিপ্লব ঘটিয়ে দেবেন। ছবিটিতে সিকিমের দরিদ্র জনগণের জীবন সংগ্রাম ও ব্যথা বেদনার চিত্রায়ণের বিপরীতে রাজ পরিবার ও রাজপ্রাসাদের বিলাসবহুল সুখী জীবনের চিত্রায়ণের মাধ্যমে এক বৈপ্লবিক মন্তাজ তৈরি করেছিলেন। এটি ছিল চলচ্চিত্র ভাষার শৈল্পিক ও নীরব-প্রতিবাদ। এই প্রতিবাদ রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে। এই প্রতিবাদ মানুষের ওপর শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে। এই চলচ্চিত্র সিকিমের মানুষের নব জাগরণের জন্য নির্মিত এক শিল্প-দলিল। চলচ্চিত্রটি যথারীতি সিকিমের রাজার পছন্দ হয়নি। ছবিটি তাদের পছন্দমতো সম্পাদনা ও কাটছাঁট করতে সত্যজিৎ রায়কে বলা হয়েছিল। কিন্তু তিনি তা করতে রাজি হননি। পরবর্তী সময় ভারত সরকারও সিনেমাটিকে রাজনৈতিক চলচ্চিত্র হিসেবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিল। খুব আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সত্যজিৎ রায়ের মতো মৃদু, মৌন ও স্থির একজন চলচ্চিত্রকার, যাঁর ছবিতে রাজনৈতিক কথকতা তথাকথিত প্রচলিত রীতিতে কখনো ছিল না, তাঁর ছবিকেই রাজনৈতিক কারণে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিল ভারত সরকার। ১৯৭৫ সালে ঘোষিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়েছিল ২০১০ সালে, সত্যজিৎ রায়ের মৃত্যুর অনেক পরে। সত্যজিৎ রায়, যিনি ছিলেন বিশ্বের সর্বকালের সেরা চিত্রনির্মাতাদের একজন, তাঁর ছবি রাজনৈতিক কারণে নিষিদ্ধ ঘোষণা করার ঘটনাটি তাঁর ছবির রাজনৈতিক দর্শন নিয়ে নতুন প্রজন্মকে নতুন করে অবশ্যই চিন্তা করতে বাধ্য করবে। এখানে একটি কথা বলা দরকার যে, সত্যজিৎ রায়ের একটি চলচ্চিত্র সরকারিভাবে নিষিদ্ধ, কিন্তু সে অবস্থায় তিনি ভারতের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মান ভারতরত্নে ভূষিত হয়েছেন। এটি একটি ব্যতিক্রমী ঘটনা।

আমরা সাধারণত দেখতে পাই, রাজনৈতিক পটভূমিতে নির্মিত চলচ্চিত্র সমূহে প্রচুর রাজনৈতিক, দলীয় ও নানা মতবাদের কথা থাকে। এসব তত্ত্ব ও কাহিনির দ্বারা মানুষের শোষণ মুক্তি ও রাজনৈতিক সংগ্রামকে এসব চলচ্চিত্রে নানাভাবে চিত্রায়ণ করা হয়ে থাকে। কিন্তু সত্যজিৎ রায় তাঁর ছবিতে অকপট মানবজীবন ও জীবনের সংগ্রামকে তুলে ধরতে গিয়ে দারিদ্র্য ও শোষণ থেকে মুক্তির কথা বলেছেন (অপু ট্রিলজি), বলেছেন

সিনেমা ও শিল্পজগতে একজন তারকাশিল্পীর টিকে থাকার সংগ্রামের কথা, পুঁজির আগ্রাসনের কথা ('নায়ক'), পুঁজিবাদী বিশ্ব ব্যবস্থায় আগামী প্রজন্মের মানুষ কিভাবে নিষ্পেষিত হচ্ছে ও তারা শিশুকালেই কিভাবে শোষণ ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছে (টু), নগরজীবনের অভাব, সংগ্রাম, দারিদ্র্য আর বেঁচে থাকার কবিতা (কলকাতা ট্রিলজি), গণতন্ত্রের সংগ্রামকে সংহত করার দিক নির্দেশনা (হীরক রাজার দেশে), মানুষের আত্মমুক্তি ও যৌন চেতনার রাজনৈতিক কাব্য যা সচরাচর বিত্তবানদের জীবনধারণ (পিকু), ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত প্রথা ও সঙ্গীতের সৌকর্য (জলসাঘর), গোয়েন্দার মাধ্যমে সত্য উন্মোচনের সংগ্রাম (ফেলুদা) ইত্যাদি যাবতীয় বিষয় তার সিনেমাতে দৃশ্যমান হয়। মানবিক, শোষণ ও দারিদ্র্যমুক্ত জীবনের দিকে স্বপ্নকে মুক্ত করার অলৌকিক চলচ্চিত্রকর্ম হলো সত্যজিৎ রায়ের সকল সিনেমা। তাঁর প্রতিটি চলচ্চিত্রেই মানবমুক্তির বারতা রয়েছে। দারিদ্র্য থেকে মুক্তি, কূপমণ্ডূকতা ও কুসংস্কার থেকে মুক্তি (আগন্তুক ও গণশত্রু), যৌনতার অবদমন থেকে মুক্তি (পিকু), ধর্মীয় গোঁড়ামি থেকে মুক্তি (দেবী), কনফিউজড রাজনীতি ও জীবনের বিভ্রম থেকে মুক্তি (ঘরে বাইরে) ইত্যাদি বিষয়াদি তার সিনেমাগুলোতে এতটা নিবিড় ও সাবলীলভাবে রূপায়িত হয়েছে যে, আমাদের জীবনের পরতে পরতে যে রাজনীতি রয়েছে তা ছবির ফ্রেমে ফ্রেমে ফিরে ফিরে এসেছে।

বস্তুত চার্লি চ্যাপলিন যেভাবে হাসি কৌতুকের মাধ্যমে মানবজীবনের গভীর বঞ্চনা ও তীব্র সংগ্রামের কথা চলচ্চিত্রে বলেছেন জীবন ও রাজনীতির কথা; আমাদের সত্যজিৎ রায়ও তেমনি মানবজীবনের যাপন থেকে খণ্ডখণ্ড চিত্র সংযুক্ত করে সেলুলয়েডে নিরবচ্ছিন্নভাবে এক জীবন সংগ্রামের রাজনীতিতে চিত্রায়িত করেছেন। এটা পৃথিবীর চলচ্চিত্রপ্রেমী ও সাধারণ সফল মানুষের জন্য রাজনীতি ও সংগ্রামের ক্ষেত্রে সাহসী প্রণোদনা। এমন জীবনলগ্ন। বাস্তবতাঘনিষ্ঠ জীবনের রাজনীতির কথা পৃথিবীর আর কোনো চলচ্চিত্রকার এমন অকপট ও পরিচিত অনুষঙ্গে বলতে পারেননি। পেরেছেন শুধু একজন সত্যজিৎ রায়।

এই ক্ষেত্রে আরো একটি কথা বা উপলব্ধি উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সত্যজিৎ রায়ের ৩৬টি ছবিই একটি থেকে অন্যটি আলাদা। তিনি তাঁর ছবিতে পুনরাবৃত্তি করেননি। তাঁর একটি সরল, সাধারণ সূত্র ছিল। জীবনের নানা বিষয়কে ছবিতে ভিন্নভিন্নভাবে আলাদা ছবিতে তুলে ধরেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর প্রতিটি ছবিই আঙ্গিক, চলচ্চিত্র ভাষা ও শিল্পগত সুষমায় নতুন এবং মৌলিক। এমনকি তাঁর নির্মিত ট্রিলজিগুলোর ছবিগুলোর প্রতিটিই একেবারে পৃথক ও আলাদা। সাহিত্যনির্ভর ছবিগুলোও মৌলিক। এছাড়া নিজের কাহিনির ছবিগুলোতেও এই স্বাতন্ত্র্য আরো প্রকটভাবে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। সত্যজিৎ রায়ের ছবি মানেই শুদ্ধ শিল্পের অবিনাশী প্রকাশ। তাঁর ছবির কাছে আসা মানে তাঁর কাছে আসা।

তাঁর মৌলিক শিল্প দর্শনের কাছে সত্যজিৎ রায়, যার খ্যাতি সারা পৃথিবী জোড়া, তাঁর ছবিগুলো পাঠ করলে এটা প্রকৃতার্থেই অনুধাবন করা যায়, তাঁর চলচ্চিত্রগুলোর শেকড় অনেক গভীর; তাঁর শিল্প চেতনা অনেক বেশি মাটিলগ্ন ও জীবনঘনিষ্ঠ। একজন শিল্পী যিনি স্বভূমের মৃত্তিকায় নিজ পায়ে হেঁটে চলেন, তিনিই আকাশ ছুঁতে পারেন। সত্যজিৎ রায় তাঁর পরিচিত মানবজীবনকে চলচ্চিত্রে চিত্রায়িত করতে করতে শিল্পের মহাকাশ ছুঁয়ে দিয়েছেন। তিনি তার ছবিতে জীবনের কথা বলেছেন, মুক্তির কথা বলেছেন, আলোর কথা, স্বপ্নের কথা, মানবতার কথা বলেছেন। ফলে তাঁর ছবি মানবজীবনের চিরকালীন মানবিক দলিল হয়েই থাকবে।

তাঁর সিনেমা দার্শনিকভাবে নানাভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। তবে তাঁর চলচ্চিত্র ভাষা নির্মাণ ও চলচ্চিত্র বিজ্ঞানের প্রয়োগের ক্ষেত্রে যে চূড়ান্তভাবে সফল এই বিষয়ে আমি নিশ্চিত। ফলে তাঁর চলচ্চিত্রগুলো আগামী দিনের চলচ্চিত্রকর্মীদের জন্য অবশ্যই পাঠ্য একথা যেমন সত্য, তেমনি তাঁর চলচ্চিত্রগুলো জীবনবোধ, নির্মাণ কুশলতা, চলচ্চিত্রভাষার নতুন আবিষ্কার, চলচ্চিত্রবিজ্ঞানের নব নব প্রয়োগ, ধারাবাহিকভাবে নতুন বোধনের উন্মোচন ইত্যাদি কারণে অতি অবশ্যই চিরকালীনতা লাভ করেছে। ব্যাপারটা এমন নয় যে, আগামী দশ, বিশ বছর পর সত্যজিৎ রায়ের চলচ্চিত্র আর প্রয়োজন হবে না; বরং ব্যাপারটা এমন যে, দিনে দিনে তাঁর চলচ্চিত্রের নতুন নতুন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হবে, নতুন নতুন মানবিকতা উন্মোচিত হবে আর দিনে দিনে চলচ্চিত্রকর্মীদের আরো তীব্রভাবে আকর্ষণ করবে। অর্থাৎ, চলচ্চিত্রমাধ্যমটি যতদিন থাকবে পৃথিবীতে সত্যজিৎ রায়ের চলচ্চিত্রগুলোও ততদিন থাকবে।

সত্যজিৎ রায় ছিলেন বিশ্বের দ্বিতীয় চলচ্চিত্রকার যাকে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি প্রদান করেছিল, ১৯৮৭ সালে ফ্রান্স সরকার কর্তৃক ফ্রান্সের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় পুরস্কার 'লিজিয়ঁ দ্য'নর' (লিজিয়ন অব অনার) প্রদান করা হয়। ফরাসি-বিপ্লবের দুইশত বর্ষপূর্তিতে তাঁকে এই সম্মানে সম্মানিত করা হয়েছিল, ১৯৮৫ সালে তিনি ভারতের সর্বোচ্চ চলচ্চিত্র পুরস্কার 'দাদা সাহেব ফালকে পদক' পান। ১৯৯২ সালে লাইফ টাইম অস্কার পুরস্কার লাভ করেন। তাছাড়াও ভারত সরকার তাঁকে সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মান 'ভারতরত্নে' ভূষিত করেন। মৃত্যুর পর জাপান সরকার তাঁকে মরণোত্তর 'আকিরা কুরোশাওয়া' পুরস্কার প্রদান করে। সত্যজিৎ রায়ের প্রতি সম্মান জানিয়ে ১৯৯৩ সালে ইউনির্ভাসিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া সান্তাক্রুজ সত্যজিৎ রায় ফিল্ম এন্ড স্টাডি কালেকশন প্রতিষ্ঠা করে। ১৯৯৫ সালে ভারত সরকার চলচ্চিত্র বিষয়ে গবেষণার জন্য সত্যজিৎ রায় চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করে। তাছাড়াও তাঁর চলচ্চিত্র অনেকগুলো আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভ করেছিল। এসব পুরস্কার সত্যজিৎ রায়ের প্রতিভা ও কর্মের স্বীকৃতি এতে কোনো সন্দেহ নাই। তবে সব পুরস্কার ও স্বীকৃতি ছাপিয়ে সত্যজিৎ রায় একজন বিশ্বসেরা চলচ্চিত্রকার হিসেবে গণ্য হবেন অসাধারণ সব চলচ্চিত্রের জন্য।

১৯৯০ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত International Film Festival of India (IFFI) তে বাংলাদেশের প্রতিনিধি হয়ে অংশগ্রহণের সুযোগ হয়েছিল। আমি এবং শৈবাল চৌধূরীসহ আমরা ২১ জনের এক প্রতিনিধিদল এই উৎসবে যোগদান করেছিলাম। সেই বার রবীন্দ্র সরোবরে এই উৎসবের উদ্বোধন করেছিলেন সত্যজিৎ রায়। আমরা তাঁকে কাছ থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছিলাম। তখন তিনি খুবই অসুস্থ। এই অসুস্থ অবস্থাতেই তিনি উৎসবটি উদ্বোধন করতে এসেছিলেন। এই কথা সত্য যে, শালপ্রাংশু এই চলচ্চিত্রশিল্পীকে কাছ থেকে দেখে বিমোহিত হয়েছিলাম। আমাদের কাছে তিনি তো স্বপ্নের মানুষ। সেই স্বপ্নের মানুষকে দেখে যে কি অন্যরকম অনুভূতি হয়েছিল তা বলে বোঝাতে পারব না। এত বছর পরেও সেই দৃশ্য চোখের ওপর সুন্দর স্বপ্নের মতো ভেসে ওঠে। সে উৎসবের সমাপ্তি ঘটে সত্যজিৎ রায়ের 'গণশত্রু' চলচ্চিত্রের প্রিমিয়ার শোয়ের মাধ্যমে। এই প্রিমিয়ারে তিনি উপস্থিত ছিলেন।

১৯৯৪ সালেও কলকাতায় অনুষ্ঠিত ২৫ তম International Film Festival of India তে (IFFI) এ আমি এবং শৈবাল চৌধূরীসহ অন্যান্যরা সরকারি প্রতিনিধি হিসেবে অংশগ্রহণ করেছিলাম। তখন সত্যজিৎ রায়ের সদ্য প্রয়াণ হয়েছে। বিশ্বচলচ্চিত্রাঙ্গণ শোকার্ত। আমরাও শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েছি। আমরা চট্টগ্রাম চলচ্চিত্র কেন্দ্রের জার্নাল 'নিও ওয়েভ' সত্যজিৎ রায় সংখ্যা নিয়ে উৎসবে যোগ দিয়েছিলাম। সংখ্যাটি আশাতীতভাবে সমাদৃত হয়েছিল। সত্যজিৎ রায়ের মৃত্যুর পর বাংলাদেশ থেকে তাঁর ওপর প্রকাশিত নিউ ওয়েভই ছিল প্রথম প্রকাশনা। সেই বারের চলচ্চিত্র উৎসব ছিল সত্যজিৎ রায়ের স্মৃতি ও শোকে ঘেরা এক উৎসব। উৎসবটি তাঁর স্মরণে উৎসর্গ করা হয়েছে। বিশ্বের নানা প্রান্তের চলচ্চিত্রকারগণ সত্যজিতের ছবির কথা বলেছিলেন, তাঁর স্মৃতি তর্পণ করেছিলেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন মাইকেলেঞ্জোলো আন্তোনিওনি, জাঁ লুক গোদার, ক্রিস্তফ জানুসি, ফার্নান্দো সোলানাস, নাগিসা ওশিমা, থিও এঞ্জেলোপুলোস, পল কক্স। এঁরা সবাই মিলে নন্দনে সত্যজিৎ রায় আর্কাইভ উদ্বোধন করেছিলেন। সেবার সত্যজিৎ রায়কে নিয়ে ভারতীয় ডাক বিভাগ একটি স্মারক ডাকটিকেট প্রকাশ করেছিল। এক কথায় বলতে গেলে পুরো উৎসবটিই ছিল সত্যজিৎময়।

এসব স্মৃতির ধারাবাহিকতায় সত্যজিৎ রায়ের জন্মশতবার্ষিকীর অনুষ্ঠানমালায় অংশগ্রহণ করছি। আজকের সেমিনারে তাঁর ওপর ক'টি কথা বলার প্রবন্ধ উপস্থাপনের সৌভাগ্য হলো। সত্যিই আমাদের চলচ্চিত্র জীবন সত্যজিৎ রায় যেন ঘিরে রেখেছেন, তাঁর ছবি, তার ছবির কথা, জীবনের কথা আমরা বলে চলেছি। সত্যজিৎকে চর্চা ও চর্যা করছি। এটি বোধ হয় উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাবে। •

নাজিমুদ্দীন শ্যামল ॥ কবি, চলচ্চিত্রকর্মী ও প্রাবন্ধিক

মৃণালের মৃগয়া শালবৃক্ষের শাখা

বিধান রিবেরু

জন্মশতবর্ষ

ঔপনিবেশিক শাসনের জড়তা থেকে মুক্তি পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা, দেশীয় বুর্জোয়া শাসক ও এলিটগোষ্ঠীর দ্বিচারিতা, মানুষের সমান অধিকার আদায়ের ভাবাদর্শে উজ্জীবিত হয়ে তরুণদের লড়াইয়ে সামিল হওয়া এবং সেসব কর্মকাণ্ড মূল্যায়নে নিজেদের সামনেই আয়না ধরা, বেকার সমস্যা, যুবকদের হতাশা ও বিস্ফোরণ–উপনিবেশ উত্তর ভারতের রাজনৈতিক এসব সংকট নিয়ে মৃণাল সেন একের পর এক চলচ্চিত্র নির্মাণ করার পর, সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি ঔপনিবেশিক আমলে প্রবেশ করবেন এবং তার ক্যামেরা বসাবেন নিরীহ, নিষ্পেষিত জনগোষ্ঠী সাঁওতালদের গ্রামে। যেখানে এই কর্মঠ জনগোষ্ঠী ইংরেজ শুধু নয়, শোষিত হচ্ছিল জমিদার ও মহাজনদের দ্বারাও

বিংশ শতাব্দীর ত্রিশের দশকে, সাঁওতাল পরগনার এক গ্রামের সাঁওতালদের নিয়ে, ভগবতীচরণ পানিগ্রাহীর লেখা কাহিনি অবলম্বনে, মৃণাল সেন 'মৃগয়া' (১৯৭৬) ছবিটি নির্মাণ করেছেন। আমরা জানি, ভারতের মুর্শিদাবাদ জেলা ও বিহারের ভাগলপুর জেলার মধ্যাঞ্চলের নাম ছিল 'দামিন-ই কো', এই অঞ্চলেই সাঁওতালদের বাস। দামিন-ই-কো অর্থ পাহাড়ি এলাকা। আগে সাঁওতালদের যাযাবর জীবন কাটলেও আনুমানিক দুশো বছর আগে তারা ওই পাহাড়ি অঞ্চলে থিতু হয় এবং কঠোর পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে পাথুরে জমিনে ফসল ফলাতে শুরু করে। এতে তাদের সুদিন ফেরে। তাতে চোখ পড়ে জমিদার-মহাজনদের। ইংরেজ শাসকদের মদতপুষ্ট হয়ে এরা নানাবিধ জুলুম চালাত গরিব সাঁওতালদের ওপর। ঋণের জালে জর্জরিত করে সারাজীবনের জন্য দাস বানিয়ে ফেলত সাঁওতালদের। শুধু এটুকু হলেও হয় তো সাঁওতালরা মুখ বুজে সহ্য করত, কিন্তু খুন, স্ত্রীহরণ, ধর্ষণ, লুটপাট ইত্যাদি অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে সাঁওতালরা বিদ্রোহ করে বসে। সাল ১৯৫৪-৫৫, এই সময়কালে তারা সংগঠিত হয় এবং আশপাশের বিভিন্ন গ্রাম থেকে সহস্র লোক জড়ো করে স্মরণকালের সমাবেশ করে। বিদ্রোহের নেতৃত্বে ছিলেন সিদু, কানু, ভৈরব ও চাঁদ। সিদু ও কানু দুই ভাই, তারা ছিলেন সাঁওতাল পরগনার রাজধানী বার্নহাইটের অদূরবর্তী ভাগনাদিহি গ্রামের মোড়ল। তারা গ্রামবাসীকে স্বপ্নে ভগবানের আদেশ পাওয়ার কথা জানালেন, বললেন, ভগবান চায় তারা এসব অত্যাচারের জবাব দিক। সিদু ও কানু ভগবানের আদেশ সম্বলিত কাগজটি গ্রামে গ্রামে পাঠালেন, সঙ্গে পাঠালেন শালগাছের ছোট শাখা। এই শাখা একতার প্রতীক, এই শাখা বিদ্রোহ করার সংকেত। সিদু-কানুদের সেই আহ্বানে একাট্টা হয় সকল সাঁওতাল। এই দুইজনের কথাই আমরা বলতে শুনি মৃণালের 'মৃগয়া'তে।

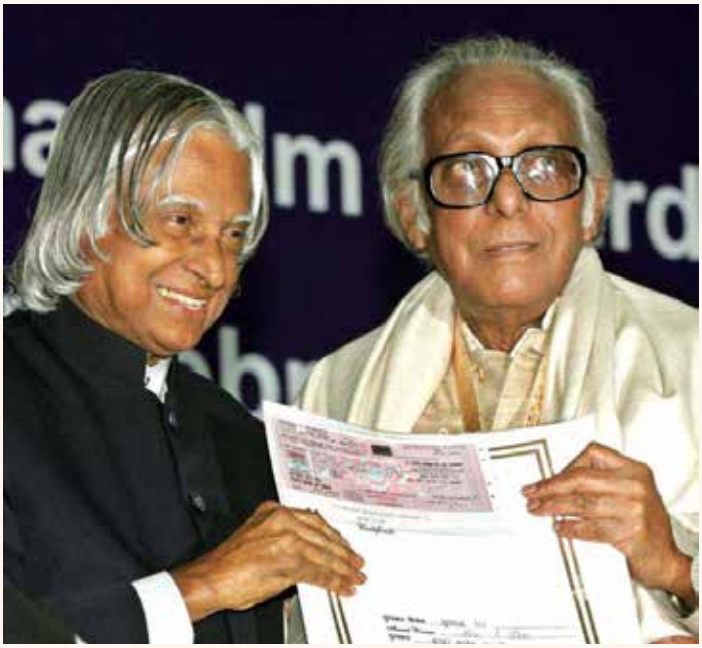

মৃণাল সেন ২ ফেব্রুয়ারি, ২০০৫-এ নয়াদিল্লিতে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি এ পি জে আবদুল কালামের কাছ থেকে দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার গ্রহণ করেন।

'মৃগয়া'তে মৃণাল সেন সাঁওতালদের বিদ্রোহের কথা বলেছেন বটে, তবে তাঁর লক্ষ্য ছিল অন্য। অতীতের 'জানোয়ার'কে মেরে বর্তমানের 'শাসক'কে ছবক শেখানোই ছিল মৃণালের মূল উদ্দেশ্য। তিনি বর্তমানকেই হাজির করেছেন অতীতের মোড়কে। সেটা কেমন করে তিনি করেছেন সেই আলাপে যাওয়ার আগে সংক্ষেপে মৃগয়ার কাহিনিটি জেনে নেওয়া বাহুল্য হবে না।

রঙিন চলচ্চিত্রটি সাঁওতাল গান দিয়ে শুরু হয়, দেখানো হয় গ্রামীণ পরিবেশ। গ্রামের নাম তালডাঙা। রাত হলে সেখানে প্রায়ই শোনা যায় ঢেরা পেটানোর শব্দ। বুনোশুয়োরের আক্রমণ থেকে শস্যক্ষেত্র বাঁচাতে সাঁওতাল গ্রামবাসী সারারাত জেগে থাকে, ছুটোছুটি করে এদিকসেদিক। সকালে সকলে মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকে। বুনো জানোয়ারের আক্রমণে ফসলের অনেক ক্ষতি হয়ে গেছে। দাদন বা ঋণের শোধ হবে কেমন করে? মহাজনের সাথে বুনো জানোয়ারের কোনো তফাৎ নেই। দুটোই তাদের কষ্টে ফলান ফসল ভোগ করতে দেয় না।

দাদন শোধ করার চিন্তায় যখন তালডাঙার মানুষ চিন্তিত, তখন গ্রামের সবচেয়ে চৌকশ শিকারি, তিরন্দাজ ঘিনুয়া সরেন, তার ওপর নজর পড়ে ব্রিটিশ কমিশনারের। সে নিজেও শিকারি। এই ইংরেজ রাজা বাবুর আমন্ত্রণে ঘিনুয়া মাঝেমধ্যে এটাসেটা শিকার করে নিয়ে যায় তার বাংলোতে। একদিন তার সামনেই কাছের ঝোপ থেকে উদ্ধার হলো মানুষের খুলি। রাজা বাবুর ভারতীয় চাপরাশি আবদুল বলে, এটা হয়তো কোনো ইংরেজ সাহেবেরই হবে। নির্মাতার ইঙ্গিত সেই ১৮৫৫ সালের বিদ্রোহ। সেসময় বহু ইংরেজ প্রাণ হারিয়েছিল সাঁওতালদের হাতে। খুলি দেখার পর ঘিনুয়ার সামনে কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে রাজা বাবু।

এরইমধ্যে একদিন সাঁওতালদের এক উৎসব চলাকালে, রাতের বেলা, বাঘে ধরে নিয়ে যায় এক ঘুমন্ত শিশুকে। তখন আবার মশাল নিয়ে বাঘ তাড়াতে নামে গ্রামবাসী। ঠিক তার পরের দৃশ্যেই দেখা যায়, ভরদুপুরে পালকি চড়ে গ্রামে ঢোকে মহাজন গোবিন্দ সরদার। তার আগমনে সন্ত্রস্ত হয় চারদিক। কারণ সকলেই জানে মহাজন শোষক ও ধর্ষক। তারপরও তারা অসহায়, কারণ তার আছে লাঠিয়াল বাহিনী, তার আছে ইংরেজ শক্তির আশীর্বাদ। বুনো শুয়োর, হিংস্র বাঘ ও লোভী মহাজন গোবিন্দের উৎপাতে দিশাহারা গ্রামবাসী। বাঘ বাচ্চা ধরে নিয়ে গেছে, এই শোকে মুহ্যমান গ্রামবাসী। সে সময় মহাজন মশকরা করে বলে, বাচ্চা নিয়ে গেছে বাঘে, যাক খাওয়ার একটা মুখ তো কমল! তার এই নিষ্ঠুরতায় আহত হয় সাঁওতালরা। তারপরও মুখ বুজে থাকে। কিন্তু দাদন আদায় না করতে পেরে যখন মাংরার মেয়ে ডুংরিকে তুলে নিতে চায় গোবিন্দ, তখন তাতে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় ডুংরির প্রেমিক ঘিনুয়া।

ঘিনুয়া ও ডুংরির বিয়ে হয়। ঘিনুয়া একদিন পাহাড়ি পথ পেরিয়ে ডুংরিকে নিয়ে যায় রাজা বাবুর বাংলোয়। সেখানে এক প্রীতি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। ঝুলন্ত ও দোদুল্যমান বোতলে ব্রিটিশ রাজাবাবু গুলি লাগাতে পারে না। কিন্তু সাঁওতাল শিকারি তির দিয়েই চাঁদমারি ভেদ করতে পারে। এও এক প্রতীকি জয়। ইংরেজের বিরুদ্ধে। চলচ্চিত্রেই আমরা আরেকটি চরিত্র পাই যার নাম সালপু মর্মু। সে ইংরেজবিরোধী স্বদেশি আন্দোলনের সাথে যুক্ত। ইংরেজ সরকার তাকে খুঁজছে, জীবিত বা মৃত। পুলিশের সহায়তায় দেশি বিশ্বাসঘাতক, পেয়াদা ডোলু হত্যা করে স্বদেশি আন্দোলনকর্মী সালপুকে। এই সালপুর ভেতরেই গ্রামপ্রধান, ঘিনুয়ার বাবা, মুখিয়া দেখতে পেয়েছিল সিদু ও কানুর ছায়া। তালডাঙার সকলেই এই সালপুকে আগলে রাখত। নিজেদের মুক্তির দিশা মনে করত। কিন্তু ডোলু সেই আশার প্রদীপ নিভিয়ে দেয়। নিজ হাতে সে গুলি করে মারে সালপুকে।

ওদিকে, দাদন আদায় করতে না পেরে ডুংরিকে ভোগ করতে চেয়েছিল মহাজন। একদিন লোক পাঠিয়ে নির্জন পথ থেকে ডুংরিকে উঠিয়ে নেয় গোবিন্দের লোকজন। কিন্তু এই খবর ছড়িয়ে পড়ে দ্রুত। সালপুকে হারিয়ে গ্রামবাসী এমনিতেই মুষড়ে পড়েছিল, কিন্তু ডুংরিকে তুলে নেওয়ার ঘটনায় তারা ফেটে পড়ে। ঘিনুয়া ছুটে যায় মহাজন গোবিন্দের কাছে। স্রেফ এক জানোয়ার বধ করছে বিবেচনা করে গোবিন্দকে সে হত্যা করে। মামলা ওঠে আদালতে।

আদালতে ঘিনুয়া বলে ইংরেজ রাজাবাবু তাকে শিকার করতে বলেছিল, বিভিন্নরকম জানোয়ার। সেজন্য তাকে বকশিস দেওয়া হতো। গোবিন্দকে মেরে সে সবচেয়ে বড় শিকার করেছে। ঘিনুয়া প্রশ্ন করে, সবচেয়ে ভয়ংকর জানোয়ার মারার পর বকশিস দেওয়ার পরিবর্তে কেন তাকে আদালতে তোলা হলো? কেন সালপুকে মারার পর ডোলুকে পুরস্কৃত করা হলো? গোবিন্দ তাদের রক্ত চুষে খেত। সালপু ছিল সাধারণের বন্ধু।

অভিনেতা রঞ্জিত মল্লিকের সঙ্গে মৃণাল সেন

কিন্তু আদালত এই ফরিয়াদ শুনবে কেন?

ফাঁসি হলো ঘিনুয়ার। যেদিন ভোরে ঘিনুয়ার প্রাণ নেওয়া হবে, সেদিন সকল গ্রামবাসী কারাগারে আসার পরিবর্তে চলে যায় উঁচু পাহাড়ে, দামিনে, যেখান থেকে সূর্যোদয় দেখা যায়। ঘিনুয়ার মৃত্যুক্ষণ তারা জানত আগে থেকেই, ঠিক সেই সময় তারা উদ্বাহু হয়ে নতুন সূর্যের দিকে তাকিয়ে থাকে। ঝড়ের শব্দ শোনা যায়। দামামা বেজে ওঠে। আর পর্দায় লেখা ভেসে ওঠে : Stand up, Stand up/ Remember the martyrs/ who loved life and freedom.

২.

ইংরেজ শাসনের ছত্রছায়ায় জমিদার, নায়েব, গোমস্তা, পেয়াদা, মহাজন, ইংরেজ সরকারের পুলিশ, আমলা, ম্যাজিস্ট্রেট সকলেই নিরীহ ও সরলসোজা সাঁওতালদের ওপর নানাবিধ অত্যাচার চালাত। সাঁওতাল বিদ্রোহ তারা নিষ্ঠুরভাবেই দমন করেছিল। কিন্তু সেই সাঁওতাল বিদ্রোহ দমন হতে না হতেই গোটা ভারতে এলো ১৮৫৭, ভারতের প্রথম উপনিবেশবিরোধী জাতীয় সংগ্রাম, মহাবিদ্রোহ। আমাদের এই চলচ্চিত্রের প্রেক্ষাপট আরো পরের, পরবর্তী শতাব্দীর ত্রিশের দশক। তখন ইংরেজবিরোধী আন্দোলন আরো জোরদার হচ্ছে ভারতবর্ষে। সাঁওতালরাও সন্ধান করছে মুক্তির পথ। সেই মুক্তির সন্ধান যেন ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভের পরও থেমে যায়নি।

সাঁওতাল পরগনার অদূরেই বিহার অঞ্চলে, মোতাবেক ১৯৭৪ সালে, গান্ধিবাদী উদারনৈতিক সংস্কারবাদী আদর্শের বিপরীতে বৈপ্লবিক বামপন্থী আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে। সেই আন্দোলনে রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক গোষ্ঠী তো বটেই, অন্যান্য নকশালপন্থী সংগঠনগুলোও যুক্ত হয় এবং গোটা আন্দোলন ধীরে ধীরে সংগ্রামী চরিত্র ধারণ করতে থাকে। তারই ধারাবাহিকতায় ভারতে ১৯৭৫ সালে জরুরি অবস্থা ঘোষণা হয় এবং তাতে রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক মহলে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় তা অব্যাহত থাকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত। মৃণাল সেনের 'মৃগয়া' মুক্তি পাচ্ছে এরইমাঝে, ১৯৭৬ সালে। একদিকে বিহারে বৈপ্লবিক সংগ্রাম, অন্যদিকে সরকারের জরুরি অবস্থা ঘোষণা–এই দুই ঘটনার মাঝে সাঁওতালদের সমবেত উদ্বাহু মুক্তির আকাঙ্ক্ষা দেখিয়ে দেন মৃণাল সেন।

'মৃগয়া' এমন এক চলচ্চিত্র, যেখানে সাঁওতাল বিদ্রোহের কথা আছে, আছে সেই বিদ্রোহ থেকে দ্রোহের মন্ত্র নিয়ে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন ও দেশীয় শোষককে জানোয়ারের মতো শিকারের ঘটনা। আরো আছে জেগে ওঠার আহ্বান। স্বাধীনতার জন্য যারা প্রাণপাত করেছেন, সিদু-কানু-ভৈরব-চাঁদ, তাদেরকে স্মরণ করে সূর্যোদয়ের মতো করে বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে দেওয়ার বার্তা। এই বার্তা নিছক সাঁওতালদের আকাঙ্ক্ষাকেই মূর্ত করেছে ব্যাপারটা তেমন নয়, অন্তত আমার কাছে নয়। মৃণাল নিজেই বলেছেন মৃগয়া ছবিতে এই ফাঁসি দেওয়াটাই সবকিছু নয়। ফাঁসি ও সাঁওতাল জাগরণকে ছাপিয়ে এই দৃশ্য আরও কিছু বলতে চায়।

মৃণাল সেন বলছেন, 'ছবিতে ফাঁসিটা দেখানো হয়েছে চিরাচরিত প্রথাতে। একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়া। কিন্তু মৃগয়া ছবিতে এটাই সব নয়। আরও কিছু। ফাঁসি হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছবি চলে যায় একটি বিশাল পাহাড়ের ওপর যেখানে কোনো গাছপালা নেই, শুধু কতগুলো বোল্ডার পড়ে আছে। বিশাল বিশাল বোল্ডার। ধীরে ধীরে ভোরের আলো ফুটছে। চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে সাঁওতাল যুবকেরা, সাঁওতাল রমণীকূল আর আবালবৃদ্ধবনিতা সবাই। দাঁড়িয়ে আছে নীরবে সেই শেষ, সেই অন্তিম লগ্নের জন্য।'

নির্মাতার এই কথা থেকেও ইঙ্গিত পাওয়া যায়, ভোরের আলো ফোটার কথা বলে তিনি বিরাজমান অন্ধকার দূর করার ইশারা দিচ্ছেন, সম্মিলিত জনতার শক্তির জানান দিচ্ছেন, আর চ্যালেঞ্জ করছেন শাসকগোষ্ঠীকে। যে কোনো মহৎ শিল্পীর একটি বৈশিষ্ট্য হলো তিনি নিজের কালকে মিলিয়ে দেয়ার চেষ্টা করবেন নিজের সৃষ্টির সঙ্গে। মৃণাল সেন 'মৃগয়া' যখন বানাচ্ছেন তখন নকশাল বাড়ি আন্দোলন একটি সাম্প্রতিক ঘটনা। এই ঘটনার সাথে ছবির অন্তিম মিলিয়ে দেখলে বোঝা যায় উল্লিখিত উদ্ধৃতিতে তিনি বর্তমানের ইশারাই করেছেন, বলছেন, মৃগয়াতে ফাঁসিটাই সবকিছু নয়, ফাঁসিকে ছাড়িয়ে তিনি আরও কিছু বলতে চেয়েছেন, সেটি তাঁর আরেকটি লেখা থেকে উদ্ধার করলেই মনোভঙ্গিটি পরিষ্কার হবে।

'মৃগয়া' সম্পর্কে মৃণাল সেন ভিন্ন জায়গায় লিখছেন, 'ফাঁসি হয় একেবারে দিনের শুরুতে সূর্য ওঠবার আগে। আদিবাসীদের জীবন নিয়ে ছবি, তাই ফাঁসির দৃশ্যের সঙ্গে ওদের কিছু রিচুয়ালকেও যোগ করে নিয়েছিলাম আমরা। শুটিং হয়েছিল দুবরাজপুরের মামা ভাগনে পাহাড়ে। পাহাড়ের গায়ে কালো পাথরের খাঁজে খাঁজে গোটা গ্রামের মানুষকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলাম। সবাই অপেক্ষা করছে সেই সময়টার জন্য যখন একদিকে ফাঁসি হবে আরেকদিকে নতুন দিনের নতুন সূর্য উঠবে। ছবির শেষ দৃশ্যে পর্দায় প্রথমে ভেসে উঠত ছোটো হরফে লেখা Stand up তারপর বড়ো হরফে। তার নিচে লেখা থাকত Remember the martyrs who loved life and freedom। এই দৃশ্যটি তৈরির পেছনে একটা ইতিহাস আছে। মৃগয়া-র প্রিন্টের কাজে মাদ্রাজ গিয়েছি। সন্ধেবেলা দুটি লোক এলো আমার হোটেলে। তাদের হাতে ছিল অত্যন্ত মূল্যবান একটি চিঠি। চিঠিটি লিখেছেন দুজন নকশালবন্দি তাঁদের ফাঁসি হওয়ার ঠিক আগে। একজন কৃষক, অন্যজন মাস্টারমশাই। চিঠিতে তারা লিখেছেন–'আমাদের এই দুজোড়া চোখ দিয়ে গেলাম তাদের জন্যে, যারা এই চোখ দিয়ে বিপ্লবটা দেখবে।' লেখাটা পড়ে আমার ভেতরটা কেঁপে উঠল। বহু হাত ঘুরে চিঠিটি আমার হাতে আসে। এই বিপ্লবের রেশটাই মৃগয়া-র শেষ দৃশ্যটাতে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছিলাম আমি। যেমন সাড়া পেয়েছিলাম অনেকের কাছ থেকে তেমন আবার ভয়ংকর ক্ষেপেও গিয়েছিলেন কেউ কেউ।'

শিল্পী সকলকে খুশি করতে পারেন না। সকলকে খুশি করার দায়ও তার নেই। মৃণাল সেন তার সমকালের আন্দোলন ও বিপ্লবী ভাবনাকে যেভাবে অতীতে গিয়ে সাঁওতাল বিদ্রোহ ও সিদু-কানুদের উত্তরসূরীর সাথে মিলিয়ে দিয়েছেন, যেভাবে তিনি সাম্প্রতিক ও অতীতের দুই ফাঁসি ও মৃত্যুর মাহাত্মকে বিপ্লবী চেতনার ভেতর দিয়ে পরিস্ফুট করেছেন, তাতেই প্রমাণ হয় মৃণাল সেন ইতিহাস সচেতন রাজনৈতিক চলচ্চিত্র নির্মাতা। এবং শুধু তাই নয়, তিনি নৈরাশ্যবাদী নন, তিনি বিশ্বাস করতেন 'আলো ক্রমে আসিতেছে। এ নভোমণ্ডল মুক্তাফলের ছায়াবৎ হিম নীলাভ। আর অল্পকাল গত হইলে রক্তিমতা প্রভাব বিস্তার করিবে, পুনর্ব্বার আমরা, প্রাকৃতজনেরা, পুষ্পের উষ্ণতা চিহ্নিত হইব। ক্রমে আলো আসিতেছে।' •

সহায়

১. মৃণাল সেন, তৃতীয় ভুবন, (কলকাতা : আনন্দ, ২০১১)
২. মৃণাল সেন, অনেক মুখ অনেক মুহূর্ত (কলকাতা : থীমা, ২০১৫)
৩. সুপ্রকাশ রায়, বিদ্রোহী ভারত (১৭৬৩-১৯৮২), (কলকাতা : র‍্যাডিকাল, ২০১৩)
৪. গৌরীহর মিত্র, সাঁওতাল বিদ্রোহ, কমল চৌধুরী সম্পাদিত, সাঁওতাল বিদ্রোহ : সমাজ ও জীবন, (কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০১১)
৫. দেবারতি তরফদার, রাজনীতির বিকল্প স্বর : (অ)রাজনৈতিক আন্দোলন, বিহারের রাজনীতি, রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, চর্চা বাংলায় ভাবি (ক্রোড়পত্র : নকশালবাড়ি বিস্মরণের বিপরীতে), (কলকাতা : তৃতীয় পরিসর প্রকাশনা, ২০১৭)
৬. কমলকুমার মজুমদার, অন্তর্জলী যাত্রা, উপন্যাস সমগ্র, (কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৪)

বিধান রিবেরু ॥ সম্পাদক ও চলচ্চিত্র সমালোচক

অন্য গ্রীষ্ম

ই সন্তোষ কুমার

অনুবাদ : তৃষ্ণা বসাক

মালয়ালম ছোটগল্প

বাস তখনও লাস্ট স্টপে পৌঁছয়নি, তার আগেই সবাই ব্যাগপত্র নিয়ে তৈরি। বেরোবার দরজার সামনে ইতিমধ্যেই লাইন তৈরি হয়ে গেছে। রঘু সেখানে গিয়ে দাঁড়াল। তার সঙ্গে সঙ্গে সুনন্দাও সিট ছেড়ে উঠে পড়েছে। কিন্তু সে সেখানে আরও একটু থাকল। ততক্ষণে বাস স্টেশনে পৌঁছে গেছে। নামার আগে রঘু পেছন ফিরে ওকে দেখতে গেল। সুনন্দা ঠিক তার পেছনেই। সে পিছিয়ে গেল। সুনন্দা সিটের ওপর ঝুঁকে আছে।

সে চেঁচিয়ে বলল 'কী হল, কিছু ফেলে এসেছ?'

'নাহ, কিছু না' সে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল। বাস থেকে সে-ই সবার শেষে নামল। অটোরিকশার জন্যে অপেক্ষার করার সময় সে শুধু তার কানে ফিসফিস করে বলল 'রক্ত' তারা সারা রাত ধরে জার্নি করেছে। বাসের ডিপো থেকে বেরিয়ে রঘু ক্লান্ত চোখে চারদিকে তাকাল। এর মধ্যেই রোদ চড়চড় করছে। ভ্যাপসা গরম একটা দিন

তাদের শহর থেকে এই বি শহর সারা রাতের জার্নি। সন্ধেবেলা ছেড়ে ভোরে বি শহরে পৌঁছয়।

তারা আগে বুক করেছিল আর তাই পাশাপাশি সিট পেয়েছিল। রঘুর মনে পড়ল ২০ বছর আগে শহর বি- তে তাদের আসার কথা। তারা বাসের শেষ দিকে সিট পেয়েছিল আর এটা ভিড়ে ঠাসা ছিল। ওদের তখন সবে বিয়ে হয়েছে। বন্ধুদের জোরাজুরিতে একদম শেষ মুহূর্তে ঠিক হওয়া মধুচন্দ্রিমা। তারা প্রথম দুদিন শহরেই ছিল, পার্ক আর আইসক্রিম পার্লারে ঘোরা, নিভু নিভু আলোর চাইনিজ রেস্তোরাঁয় নুডলস আর মাশরুমকারি খাওয়া, অচেনা এক ভাষার সিনেমা দেখা, তারপর ওখান থেকে তিন ঘণ্টার পথ পেরিয়ে এক হিল স্টেশনে গিয়ে আবার সেইদিনই ফিরে আসা। তাদের মনে হয়েছিল শহরটা তাদের যথেষ্ট দেখা হয়নি আর তাই তারা কেবল রাস্তায় রাস্তায়, খোলা জায়গায় ঘুরে বেড়াত। সেই প্রথম তারা এস্কেলেটর চড়েছিল। তারা শহরের মলগুলোতে যেত, শুধু এস্কেলেটর চড়ার জন্যেই, আর দুনিয়ার যত আজব জিনিসে ঠাসা দোকানের কাচের জানলার দিকে তাকিয়ে থাকত।ওরা ফিরে এসেছিল ট্রেনে করে। সেইসব দিনে দুনিয়ার বিচিত্র বিষয়ে বিরামহীন বকে যেতে পারত তারা, সফরের ক্লান্তি গায়ে লাগত না। সেসবের আবছা স্মৃতি এখনও তার মনে আছে। সুদূর স্মৃতি, যেন এসব কিছুই অন্য জন্মে হয়েছে। সুনন্দার মনে হলো না সেসব কিছু মনে আছে বলে।

আর এখন, পাশাপাশি বসে এসে, তারা ক্বচিৎ কোনো কথা বলেছে, ভ্রমণ করেছে অচেনা লোকের মতো। রঘুর খুব বিধ্বস্ত লাগছিল, হয়তো গত রাতে ভালো ঘুম হয়নি বলে। সে তার সিটে চোখ বুজে বসেছিল। সে বুঝতে পারছিল সুনন্দাও তার মতো বসে আছে, না ঘুমিয়ে। ভিডিয়ো স্ক্রিনে একটা হিন্দি সিনেমা দেখাচ্ছিল, সেটা অনেক রাত পর্যন্ত চলেছিল। বাইরে থেকে মাঝে মাঝে আলো চুঁইয়ে আসছিল, যেন নিঃসীম অন্ধকারকে আরও জোর দিয়ে বোঝানোর জন্যে।

এক রাতের দুপ্রান্তে দুটো আলাদা শহর। রঘু ভাবতে চেষ্টা করল তারা একটা অন্ধকারের লম্বা সুড়ঙ্গ দিয়ে চলেছে।

পরে কোনো এক সময়ে সে ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুম ভাঙল তখন প্রায় ৬টা।

ধূলিধূসর জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখল বাইরের পৃথিবী তখনো তরল হয়নি। রাস্তাঘাট তখনো অন্ধকার, যেন এক বিশাল ছায়া পড়ে আছে। সে কয়েকটা আলোকিত বিলবোর্ডে বি শহরের দূরত্ব পড়তে পারছিল। তারপর আবার অন্ধকার ফিরে আসছিল। বাস পরিত্যক্ত বন্ধ্যা জমির পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। কিছু পরে সে বি শহরের রাস্তার নামগুলো বোর্ডে পড়তে পারছিল। বাস আস্তে আস্তে শিরিশ গাছগুলোর পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, যে গাছগুলো প্রথম সকালের অল্প আলোয় তাদের ওপর ঝুঁকে আছে। শিরিশ গাছের অন্তহীন সারি বি শহরের বৈশিষ্ট্য।

হয়তো তাদের প্রথমবারের আসার সময়ের সেই গাছগুলোই, একটু বয়স হয়েছে। গাছগুলো ছাড়া বাকি সবকিছু অচেনা। উঁচু উঁচু পিলারের ওপর নতুন ব্রিজ, একটা নতুন ক্লক টাওয়ার, বহুতল বাড়ি, চওড়া রাস্তা, খুব ভোর বলে তখনো ভিড় নেই, জলের ওপর চলা নৌকোর মতো গাড়িগুলো যেন ভেসে চলেছে, তার চোখের সামনে কুড়ি বছর আগের শহরটা ভেসে উঠল। এটা কখনো সেই আগের শহরটা হতে পারে না। রঘুর মনে হলো। তারা যে এখানে আগে এসেছিল, সেটা বোধহয় নেহাতই মনের ভুল।

'রক্ত' সুনন্দা আবার বলল 'সারা সিটে লেগেছে। ওহ ওরা কী ভাববে'

'ওরা কী ভাববে?' রঘু বলল 'আমাদের ওদের সঙ্গে আর দেখা হচ্ছে নাকি? এইসব তো হয়েই থাকে। ওরা ধুয়ে পরিষ্কার করে ফেলবে।'

কিছুক্ষণ ওরা কোনো কথা বলল না। গন্তব্য শুনে অটোওলা যেতে চাইছিল না। অনেক দূর। রিটার্ন ট্রিপ পাওয়ার চান্স কম।

'আমি একদম ভিজে গেছি' সুনন্দা বলল, 'কাছে একটা ঘর ভাড়া নেওয়া যাক।'

'কিন্তু ডাক্তারের ক্লিনিক এখান থেকে বেশ দূরে।' রঘু বলল 'আমরা ইতিমধ্যেই ক্লিনিকের কাছের একটি হোটেলে ঘর বুক করেছি, তাই না? ওখান থেকে ক্লিনিক যাওয়া সুবিধে হবে।'

'আমি অতক্ষণ অপেক্ষা করতে পারব না। আমার পেছন পুরো ভিজে গেছে।'

'তুমি প্যাড ইউজ করনি?'

'তুমি বুঝতে পারছ না?' সুনন্দা ক্ষুব্ধ হয়ে তার দিকে তাকাল। 'এটা কি প্যাড ইউজ না করার জন্যে? প্যাডে কুলোচ্ছে না। বৃষ্টির মতো ঝরছে। আমি পুরো ভিজে গেছি। লোক নজর করার আগেই আমি এই ভিজে প্যাডগুলো থেকে মুক্তি চাই।'

রঘু খুব ঘামছিল 'এখানকার আবহাওয়া বদলে গেছে।' রঘু অটোয় গুছিয়ে বসে বলল। 'আগে এমনকি গরমকালেও ফ্যান চালাতে হতো না। বড় বড় বাড়ি, বড় বড় রাস্তা, গাড়ি সব গ্রাস করে ফেলেছে। বৃষ্টি আর কুয়াশা উবে গেছে।'

সুনন্দা উত্তর দিলো না। সে বসা আর দাঁড়ানোর মাঝামাঝি এক ভঙ্গিতে সিট থেকে নিজের শরীর তুলে রাখার চেষ্টা করে যাচ্ছিল।

রঘু দেখল শহরের বিলবোর্ডে একটা নতুন জীবন। গয়না, স্মার্ট ফোন, নারী-পুরুষের ব্র্যান্ডেড পোশাক, ভিলা আর ফ্ল্যাট, একই নামের মদ ও সোডা ওয়াটার, মিনারেল ওয়াটার, সিনেমা, আকর্ষক ফিগারের চোখ ধাঁধানো মডেল অন্তর্বাস আর কনডোমের বিজ্ঞাপন। সাধারণত এমন বিজ্ঞাপন সামনে এলে, সুনন্দা মন দিয়ে রঘুকে দেখত। ওর চোখ বিলবোর্ডে দ্রুত ঘুরছে, এটা তার নজর এড়াত না।

'ছি, এই পুরুষগুলো বেহায়া...' ভর্ৎসনার গলায় বলত সুনন্দা। 'কেন তাকিয়ে আছ ওদিকে?'

'আমি শুধু পাশে লেখা ফোন নাম্বারগুলো পড়ছিলাম' চোখ সরিয়ে রঘু বিড়বিড় করে বলত।

'অ্যাই, তুমি এত মিথ্যে কেন বলছ? ফোন নম্বর... দেখো দেখো এনজয় করো। আমার কিছু এসে যায় না। কিন্তু এত বানিয়ে বানিয়ে বলো না। এইসব ছবি আর বিজ্ঞাপন তোমার মতো নির্লজ্জ লোকেদের জন্যে।'

'ঠিক বলেছ' রঘু হেসে ফেলত 'এইসব বিজ্ঞাপনের লোকগুলো ভিক্ষে করে বেড়াবে যদি অন্তত আমার মতো কিছু লোক ওগুলো না দেখে।'

কিন্তু আজ সুনন্দা কিছু দেখছিল না।

রঘু আগে করা হোটেলের বুকিং ক্যান্সেল করে সুনন্দার কথামতো কাছাকাছি কোনো ঘর খুঁজছিল। অটো একটা ছোট হোটেলের সামনে থামল।

'এইটা না। একদম দেশলাই বাক্সের মতো লাগছে' রঘু বলল।

'এতেই চলে যাবে' সুনন্দা ততক্ষণে সুটকেস নিয়ে নেমে পড়েছে 'আমাদের মোটামুটি রকম হলেই চলে যাবে। বড়জোর এক সপ্তা, দেখতে দেখতে কেটে যাবে।'

রঘু আর প্রতিবাদ করল না।

'এই গরমে এত ছোট ঘর। যথেষ্ট আলোও নেই ঘরে' ময়লা পর্দা সরিয়ে জানলা খোলার চেষ্টা করতে করতে রঘু বলল। 'একটা এসি ঘর নেওয়া যেত না? আমি আর গরম ধুলো সহ্য করতে পারব না। তুমি জানো আমার অ্যালার্জি আছে। একবার হাঁচতে শুরু করলে আর থামব না। তাছাড়া এখন আমাদের এসি রুম নেবার ক্ষমতাও আছে। আমাদের যখন ছিল না, তখন এইসব ঘরে মানিয়ে নিয়েছি।'

'আমি এর বেশি কিছু চাই না। কেউ দেখবে না, আমিও কাউকে দেখব না, এমন একটা জায়গা যেখানে আমি একলা হতে পারব। আপাতত এইটুকুই দরকার আমার।'

সুনন্দা বিছানায় সুটকেস রেখে তাড়াতাড়ি বাথরুমে ঢুকে গেল।

'সুইচগুলো কোথায়?' রঘু দেওয়ালের দিকে তাকাল। অন্ধকার যেন একটা অদৃশ্য জন্তুর মতো ওত পেতে বসে আছে, তার ভয় হলো। যখন সে জানলা খোলার চেষ্টা করল, এর কব্জাগুলো আর্তনাদ করে উঠল। নিশ্চয় বহু বছর এগুলো খোলা হয়নি। যখন সে একটা পাল্টা খুলতে পারল, বোঝা গেল কেন জানলা কখনো খোলা হয়নি। খুব কাছেই একটা বিশাল বিল্ডিং, আলো আর হাওয়া আটকে দাঁড়িয়ে আছে।

শেষ পর্যন্ত সে সুইচ খুঁজে পেয়ে আলো জ্বালাল, খুবই কম আলো। অন্ধকার নামের জন্তুটা একটুখানি দূরের কোণে সরে গেল, এই যা।

রঘু বি শহরের বিখ্যাত ডাক্তারের সঙ্গে দুসপ্তাহ আগে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে রেখেছিল। নেট ব্যাংকিং করে টাকা জমা করেছিল।

সুনন্দা জোর করেছিল এই শহরেই ডাক্তার দেখাবে। অথবা এইরকম কোথাও। তাদের হোম টাউন থেকে যত দূরে সম্ভব। এমন একটা শহর

যেখানে কেউ তাদের চেনে না, কিংবা তাদের নিয়ে তাদের কারো মাথাব্যথা নেই। রঘু এর কারণ বুঝতে পারেই। তাদের শহরের হসপিটালগুলোয় সব ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুবিধে আছে। এই এতটা আসা, থাকার ব্যবস্থা, আর এই কষ্ট অসুবিধে ফালতু ফালতুই করা। কিন্তু সুনন্দার জেদ।

'তুমি কি অন্যদের জেনে ফেলার ভয় পাচ্ছ?' রঘু জিগ্যেস করেছিল

'সত্যি বলতে ঠিক ভয় নয়। এটা অন্য কিছু। একধরনের কমপ্লেক্স। আমি শুধু অন্যদের ভয় পাচ্ছি না, নিজের শরীর নিয়েও আমার ভয়।' সুনন্দা বলেছিল। সেবার তারা প্রথমবার গাইনি দেখিয়ে ফিরছিল। 'আমি নিজের শরীরকে বুঝতে পারছি না। এই আমি জাস্ট ছুঁয়ে বুঝতে পারছি এর উষ্ণতা বা শীতলতা। আবার কখনো এটা একেবারে অচেনা লাগছে।' সে অনুতপ্ত গলায় বলেছিল।

'লোকের কথায় আমার অভ্যেস হয়ে গেছে। ওদের বহুদিন চিনি। আমি জানি ওরা কী ধরনের প্রশ্ন করবে' সুনন্দা বলল। এটা সত্যি কথা। ওষুধপত্র চিকিৎসা এসব নিয়ে প্রশ্ন সুনন্দার অভ্যেস হয়ে গেছে। নিসঃন্তান দম্পতিরা বিভিন্ন চিকিৎসা পদ্ধতি সম্পর্কে উপদেশ, সাজেশন, সহানুভূতি কৃচিৎ বিদ্রুপও। এটা তো রুটিনের মতো হয়ে গেছে। কিন্তু সেটা এখন কথা নয়। 'আমি যখন আমার শরীরের সামনে দাঁড়াই, মনে হয় আমি ব্যর্থ। মনে হয় এর ওপর আমার কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। এ যে কেমন আচরণ করবে ভেবে আমি সংশয়ে পড়ি।'

'শরীর নিয়ে ভাবার কী আছে?' রঘু জিগ্যেস করল। তার বিরক্ত লাগছিল। 'এখন তো অল্প ব্লিডিং হয়, তাই না? ডাক্তার তো বলছে এই বয়সে এটা খুবই স্বাভাবিক। হয়তো একেবারে বন্ধ হয়ে যাবার আগে বেশি বেশি হচ্ছে...'

'বন্ধ হয়ে যাক। হলেই খুশি হই। কিন্তু সেটা আমার সমস্যা নয়। তুমি তো জানো আমার সাইকেল কত নিয়মিত ছিল। আমি যেন একটা ঘড়ি ছিলাম যেটা ঠিক আটাশ দিনে বাজত। এত নিখুঁত ছন্দ। তারপর চারদিনের সেই নিশ্চয়তা থেকে একদম ওলটপালট।'

সুনন্দা আগে থেকে সেই চারটে দিনের চারপাশে গোল লাল দাগ করে তৈরি হতো। রঘুর কাছেও একটা রিমাইন্ডার ছিল। রেড অ্যালার্ট। এই যে আসছে সেই লাল দিনগুলো। এই চারদিন আমার সঙ্গে এমনকি কথা বলার কথাও ভেবো না।

সেসব দিনের কথা ভেবে রঘু হাসল।

সুনন্দা বলল 'জানি তুমি হাসছ কেন। দেখো ওই দিনগুলো সত্যি মারাত্মক ছিল আমার কাছে। আমার সবকিছুর ওপর রাগ হতো। যেন একধরনের প্রতিশোধস্পৃহা। আমার শরীর যেন ধাতব তরলের মতো ফুটত। তারপর ঠান্ডা বরফ হয়ে যেত তুষারঢাকা হ্রদের মতো। ওইসব দিনে আমি কারো সঙ্গে দেখা করতে চাইতাম না, একা থাকতে চাইতাম, নিজের মধ্যে গুটিয়ে।'

রঘু দেখতে পেল একটা শিরিশ গাছ, যার পাতাগুলো মুড়ে আছে।

আস্তে আস্তে ওর অভ্যেস হয়ে গেল। ট্যাবলেট, টনিক, আয়ুর্বেদের ওষুধ আর কঠোর ডায়েট। তবু সেই দিনগুলো বেড়েই চলল। নিষ্ফলা ঋতু। একঘেয়ে দিন, একঘেয়ে রুটিন। সুনন্দা একা একা ঘোরা তীর্থযাত্রীর মতো উদাসীন থাকত।

তিনমাস আগে সব বদলে গেল। ক্যালেন্ডারের লাল বৃত্তগুলো অর্থহীন হয়ে গেল। এক দিন, দুদিন, তিনদিন 'কিছুই হচ্ছে না। তাহলে কি আগের সব চিকিৎসা এত বয়সে এসে ফল দিচ্ছে?' রঘু খানিক মজার গলায়, খানিক সিরিয়াস হয়ে বলল। সুনন্দা হাসল না। তার মনে হলো এই প্রথম তার শরীর এমন একটা ভাষায় কথা বলছে যেটা সে বুঝছে না। তৃতীয় সন্ধেয় রঘু পরেরদিন সকালে ডাক্তারের অ্যাপ ঠিক করল। কিন্তু সেই রাতে যেন তার শরীর অনুতপ্ত প্রতিক্রিয়া দিল। রক্ত থামছেই না। রঘুর সেই রাতের কথা মনে পড়ল যখন হতাশা, ভয় আর অপমান সুনন্দাকে ছেয়ে ফেলেছিল। দুজনেই তারা সারারাত জেগে ছিল। সকালে যখন সে ডাক্তারের কাছে ওকে নিয়ে যাবে বলে গাড়ির চাবি বার করছিল, সুনন্দা বারণ করল। দরকার নেই। সবকিছু মনে হচ্ছে ঠিকঠাক।

'তবু চলো। যদি আবার গতকালের মতো শুরু হয় তখন?'

'হলে দেখা যাবে।'

'যে সময় দেওয়া আছে তখন গেলেই হয়।'

'না। ব্লিডিং বন্ধ হয়েছে। আমি ভীষণ ক্লান্ত। ঘুমোতে চাই।'

অফিস যাওয়ার আগে এক মুহূর্তের জন্যে থমকে রঘু দেখল বিছানার এক কোণে গুটিশুটি মেরে শুয়ে আছে সুনন্দা। ওর ফ্যাকাশে চোখের পাতা কেঁপে কেঁপে উঠছে যেন কোনো দুঃস্বপ্ন দেখেছে।

ঘুম কোনো কিছুর সমাধান নয়। এটা শুধু বাইরের জগৎকে সাময়িক আমাদের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখে। জেগে উঠতেই সুনন্দার আবার স্রোতের মতো রক্তপাত শুরু হলো।

সন্ধেয় সুনন্দার আপত্তিকে অগ্রাহ্য করে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেল। ডাক্তার একজন বয়স্ক মহিলা। তিনি তাদেরই চিকিৎসা করতেন যাদের একদম প্রথম থেকে চেনেন অথবা একেবারে এড়িয়ে যাওয়া যাবে না এমন কেসে। তিনি জানালেন সেটাও তিনি বন্ধ করে দিচ্ছেন। তিনি যদি এখানেই থেকে যান, তো রোগীরা আসতেই থাকবে আর তাদের না করা শক্ত হবে। তিনি বিদেশে মেয়ের কাছে চলে যাবেন, অনেকদিন ধরে ডাকছে মেয়ে। 'ওখানে গিয়ে বিশ্রাম পাব, এখানে যা সম্ভব নয়।'

তিনি ধৈর্য ধরে সুনন্দার কথা শুনলেন, কিছু প্রশ্ন করলেন, ব্লাড প্রেসার আর টেম্পারেচার চেক করলেন 'আপাতত এই ওষুধগুলো খাও। কয়েকটা টেস্ট করাতে হবে।'

'কখনো কখনো ইউটেরাস কেটে বাদ দিতে হয়, তাই না ডক্টর?' সামান্য যা শুনেছে তার ভিত্তিতে প্রশ্ন করল রঘু।

'হ্যাঁ। কিন্তু সেটা তো ছোট বিষয়। ওষুধের সাইড এফেক্টস কিংবা কখনো' বলতে বলতে থেমে গেলেন ডক্টর।

'ভেবো না। শিগগির কিছু টেস্ট করাব আমরা' তারপর তিনি আরেকজন ডাক্তারের নাম করে বললেন 'ওঁকেও দেখাও। আমি ফোন করে বলে দেবো।'

'উনি কে?' পুরুষ গাইনিকে দেখানোর ব্যাপারে সুনন্দার দ্বিধার কথা ভেবে রঘু জিগ্যেস করল।

'চিন্তা করো না' ডক্টর হাসলেন 'ও একটা বাচ্চা ছেলে। ব্রিলিয়ান্ট। আমার ছেলের ক্লাসমেট। ও আমার ছেলের মতো।'

উনি রঘুর দিকে তাকিয়ে বললেন 'লেটেস্ট যা ডেভেলপমেন্ট সব সে জানে। আমি আজকাল অতটা আপ টু ডেট নই।'

'কেন ডক্টর, কিছু কি...'

'না না, সেরকম কিছু না। জাস্ট দেখে নেওয়া কোন গ্রোথ হয়েছে কিনা... সেরকম কোনো সম্ভাবনা যে নেই সেটাই নিশ্চিত হয়ে নেওয়া। আর কিছু না। ওকে দেখিয়ে নাও।'

তাঁর দেওয়া ওষুধগুলো শুরুর দিকে ভালোই কাজ করছিল। কিন্তু আস্তে আস্তে সুনন্দার শরীর তাদের কব্জা করে ফেলল। ঘড়ির কাঁটা পাগলের মতো নড়ছিল। তার অভ্যেস হয়ে গেল রক্তপাতের সঙ্গে যা যে কোনো দিন যেকোনো সময়ে হতে পারে। যেমন হঠাৎ করে শুরু হতো, তেমনি হঠাৎ করেই থেমে যেত। সুনন্দার ক্যালেন্ডার লাল ফুলের একটা বাগান হয়ে গেল।

লেডি গাইনির পরামর্শমতো ওরা সেই তরুণ ডাক্তারের কাছে গেল। কিছু ওষুধ, একটা স্ক্যান আর এক সপ্তাহ পরে আবার দেখানো।

'আমাদের টেস্ট করাতে হবে। হ্যাঁ, এটাই করতে চাইছি আমি' দ্বিতীয়বার গেলে ডাক্তার তাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করল। রঘু সেবার সুনন্দাকে নিয়ে যায়নি। 'আমি দেখছিলাম আগে আপনার স্ত্রী যে ওষুধগুলো নিয়েছিল। কড়া ডোজের ওষুধ সেসব। গুগল খুঁজে দেখতে পারেন। বিদেশে বেশিরভাগই ব্যান হয়ে গেছে। ইউরোপে বেশিরভাগ ওষুধই ৩০ বছর আগে তৈরি বন্ধ হয়ে গেছে। আমি ভাবছি এসব ওই ওষুধগুলোর জন্যে হচ্ছে কিনা।'

'কিন্তু ডক্টর, আপনি তো আমাকে বললেন না ঠিক কী হয়েছে' রঘু মনে করাল।

'তার জন্য থরো চেক আপ করাতে হবে। স্ক্যান রিপোর্ট এসে গেছে' একটা ফাইল বার করে বলেন তিনি। 'একটা গ্রোথ দেখা যাচ্ছে। কিন্তু খুব স্পষ্ট নয়। তাছাড়া, ইউটেরাসের বাইরেও ছড়িয়েছে। কিন্তু কতটা সিরিয়াস আর অন্যান্য খুঁটিনাটি এই রিপোর্টে পাওয়া যাবে না। একটা বায়োপ্সি করতে হবে। • *চলবে...*

তৃষ্ণা বসাক ॥ কবি ও অনুবাদক

রঞ্জিত সিংহ

অসমাপিকা

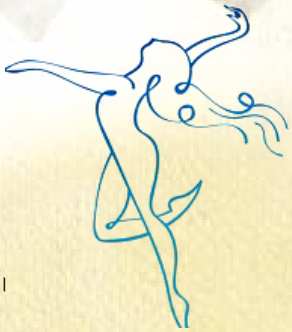

পশ্চিমের জানলাটা খুললেই ঐ রাস্তার মুখটা
দেখা যায়। বিষণ্ণতা না নিস্পৃহতা! ঠিক বুঝে উঠতে
পারি না। বুকের ভিতর ঝড়ের মতন যেন কী–
কোথায় যেন কী একটা গোলমাল। বেঁচে থাকতে
ঐ রাস্তায় আর কখনো যাব না। জীবনটা যে
প্রয়োজন-অপ্রয়োজনে বাঁধা।

মোমবাতির আলো মৃদু হতে হতে নিভে গেল।
হঠাৎ-ই। যা, কিছু ঘটনা সবই ঐ হঠাৎ। কিন্তু
একটু ভাবো, 'হঠাৎ' বলে কিছু নেই, সবই পূর্বনির্দিষ্ট।

আমার কেউ নেই। সন্ধ্যা হতেই যে যার ঘরে।
নব্বই ছুঁতে দেরি কোথায়? তবে ততদিন বাঁচলে হয়।
জন্মাবধি এখানেই আছি, কোথা থেকে যাব,
বলতে পারব না।

সে চলে যাবার পনেরো দিন আগেও উঁচু গলায় :
এই লিলি, কে এসেছে দ্যাখ, ঐ সল্টি বিস্কুট
দার্জিলিংটি নিয়ে আয়, বলতে হবে কেন?

ও থাকতে ঐ ছিল। এখন? বাদুড়ের ঝাঁক সফেদা গাছটাকে
ঘিরে নাচানাচি করছে। গাছটায় ফল ধরেছে
নিশ্চয়। পাকা ফলের গন্ধে সর্বত্র আনন্দ ছড়িয়ে গেছে।
কোথায় আনন্দ? ঝড় উঠছে। দেবীপ্রসাদকে
চিনতে পারছি না। ঘূর্ণিঝড় দেবী, এত বেগ,
ছড়াচ্ছে এতরকম রঙ, কখনো আগুনে লাল,
কখনো-বা মেটে, কখনো কচি কলাপাতা,
দেবী ঘুরছে বোধনের বাজনার মতো। ঘুমের চোখে
কতকী দেখি। জাগলেই কিছু নেই। পোড়া কাঠ,
ছাই। তপতী বলেছিল বিমলকে–'আমাকে কাঠেই দিস'।
সামনে মা কালী, রক্তজিভ, ক্রুর দৃষ্টি।
সর্বত্র ক্ষমাহীনতা, সর্বত্র নিয়তির ব্যস্ততা।
আমি বাকরহিত, ঘুমন্ত জাগরণ। কে যেন চিৎকার করে বলল,
কী হে, আর কতদিন? গোলমালের শব্দ কানে যাচ্ছে কী?
কে? কোথাও তো আর শব্দ নেই।
বাউন্ডারি ওয়ালে শুধু শকুনের সারি।

কচি রেজা

প্রণাম

বাড়ি ফিরি, দেখি দরজায় পোষা বেড়ালের অপেক্ষা
দয়া, তুমি শিখিয়েছ এই গোপন মায়া
নত হই পাশে বসে থাকে যেন আত্মীয়
সফল মানুষ যারা, সটান উঁচু
সরে গিয়ে প্রণাম করি
আমি উঁচু হতে পারি না বরং ব্যর্থ হই
ব্যর্থতার গা ঘেঁষে বসে দেখি, নিজেকে প্রণাম করা যায়
ভিতরভর্তি কান্না, কান্নার সুন্দর গন্ধ থাকে, কান্নার গানে বৃষ্টি নামে
জেনেছি বৃষ্টিও দয়া, প্রণাম করি।

সুব্রত সরকার

বুদ্ধ-বচন

শাস্তা, এই রাত্রি অযোনিসম্ভূত–

ঐ দেখো চাঁদ পক্ষ বিস্তার করে উড়ে চলেছে নভলোকে
তার অর্থ রাজ্যে এবার করাল দুর্ভিক্ষ নেমে আসবে
লোলচর্ম শ্লোক পথে পথে ভিক্ষা করে
যশকদান্নকর্না।

বায়স ও কুক্কুরের ন্যায় তাহাদের কীর্তন করে লোকে।

এই সেই মহারাত্রি, পিপাসায় পাতাল অবধি দৃষ্ট হয়–
শাস্তা, এও প্রণম্য, তুমি
অন্তরের নিভৃতে প্রদীপ জ্বেলে একে আরাধনা করো
কারণ সকল সর্বনাশের শেষে আর এক
আরম্ভের শুরু!

শাস্তা, প্রাণ অঙ্গষ্ঠ-প্রমাণ, অনামিকা মেঘ ও স্তুতি–
সচতুর ঢাক বাজছে, যশসূর্য যায় চলে
মনান্তরাল পার্শ্বে!

শুধু কবি একলা দেখতে পায় অসুখজৈবনরক্তজরামৃত্যু–
যেন পিপাসার ফাঁস টিনভাঙার শব্দের মতো
কঠিন গলায় দড়ি হয়ে আঁটকে আসছে
শ্বাসকষ্টের পৃথিবীতে!

নীলাঞ্জন বিদ্যুৎ

রক্তে আমার শঙ্খের ধ্বনি

জন্ম আমার জলতরঙ্গে
সমুদ্রপ্রিয় মন
তোমাকে ডেকেছি জলের সে নীলে
আমি আজ উন্মন।

মোহকে পুষিনি হৃদয়ে আমার
বিত্ত বাসনা নয়
মাড়াইনি আমি ক্ষমতার ছায়া
করিনাকো অভিনয়।

ডেকেছিলে কবে নগর-বালিকা,
'উঠে এসো জলচর'
রক্তে আমার শঙ্খের ধ্বনি
জলকে করিনি পর।

পিতা ছিল জলদস্যু; এখন
চারণ কবি সে আমি
লুটে নিতে চাই তোমার হৃদয়
কবিতার চেয়ে দামি।

ঘূর্ণির গোল চোখে চোখ রেখে
আমরা যে বড় হই
তোমাকে দেবো সে সাহসের বাঁশি
চলো সুরে জেগে রই।

রবু শেঠ

দাহকলা

আকন্দ ফুল ফুটছে দৃশ্যত
আর তুমি বেণিময় ধারণ করছ
বিপুল মেঘের বার্তা,
মনিটরে এরকম দেখাচ্ছে–
'রেইন কামিং'
আদতে কিন্তু বৃষ্টি আসছে না–

পুরাতন খরায় পুড়ে যাচ্ছে প্রেমিক,
নতুন হাওয়ায় দল বেঁধেছে
ঝাঁকঝাঁক অর্ধবিবাহিতা

উপরি প্রণয়ে কাটাচ্ছে সময়
কেউ কিন্তু ঘর বাঁধতে চাইছে না...

আনিফ রুবেদ

মানুষের জীবনযাপন ও মনযাপন

বৃষরাশি– কন্যারাশি
এবং
মধুরাশি– বিষরাশি
এর
ভেতরেই জগতের সমস্ত মানুষ
নিজেদের নাম লিখিয়ে
যাপন করছে যাপনা।

আসাদ মান্নান
আকাল পাঁচালি

১.
যে থাকে নিঃসঙ্গ একা জনারণ্যে; ঈশ্বরের মতো
খুব একা তাকে আমি কখনো দেখিনি; অবিরাম
ঘড়ির কাঁটার মতো জীবনের কঠিন ডায়ালে
সে ঘোরে মাতাল রোদে–পাতালের আঁতুড়ি কান্নায়;
যে গ্রহ এখন আজ মানুষের লোভের আড়ত
সে-গ্রহে সুন্দর একা, পুষ্পহীন মানব উদ্যান:
গন্ধহীন গন্ধরাজে ভরে উঠছে ফুলের পসরা;
বিপন্ন সৌহার্দ প্রেম, তিরোহিত মিলন সংগীত।

কণ্টকিত সংকটের ফুলে ফুলে সাজানো শয্যায়
দুঃস্বপ্নের চিতানলে মৃতবৎ আমি শুয়ে আছি:
ফুলের ভেতর থেকে উড়ে এসে একটা ভ্রমর
আমাকে গুনগুন স্বরে আচানক স্বপ্নে বলে গেল,
এ গ্রহে মানুষ নেই–সবখানে অশান্তির দানো
চলো কবি চলে যাই অন্য গ্রহে, অন্য নিরালোকে।

নিমাই জানা
সিরামিক থালার পুরোহিত ও যক্ষ্মা রোগীদের উপপাদ্য

যক্ষ্মা রোগীদের গলায় ধূসর ঝুলে থাকা পাথর জোনাকির মতো কার্বো মেথোক্সিনেট রাতের নিরক্ষীয় স্বর্গারোহন স্নানের পর আমরা এক সাদা কার্বনেটেড শঙ্খ ভান্ডারে ঢুকে নিজেদের খোলস রেখে দিলাম,

চক্রাকার খণ্ড খণ্ড শিরদাঁড়াবিহীন লজ্জাবতী রঙের জলধোয়া মাছের অবৈধ সেরামিক থালার দীর্ঘ চিৎকারের ওপর পৃথিবীর জান্তব বিভৎসতা প্রতিটি তিরন্দাজ নারীর মৃত্যুকে গিলে খেতে পিচ্ছিল দুই পেণ্ডুলাম দৈর্ঘ্যের সময় লেগেছিল মাত্র, শুকতারার মতো কঠিন পাঁজরের ওপর বসে থাকা গোলাপি অন্তঃপুরের স্নায়ুহীন পিশাচ পুরুষেরা মাঝরাতে এসে পিচ্ছিল কাঞ্চনজঙ্ঘার আচমনের পর মৃত হরিণীদের চামড়ার আসনে বসে নিজেদের খণ্ডিত মাথাকেই পুজো করছে চরুমৃত খাওয়া পুরোহিত কঙ্কালের সাথে মাথার দিকে গেঁথে রাখা ১৩৩টি তিরের প্রজনন কেন্দ্র, জলপ্রপাত সীমারেখার মতো গন্ধর্ব দেশ, কচ্ছপের ভাস্কর্য

যৌনপ্রদেশের অবৈধ সংক্রমিত শ্মশানের তীর্থযাত্রায় মুখ গুঁজে বৃত্তাকার অলৌকিক ঘোড়ারা আঁশময় দেয়ালের দিকে উঠে যাওয়ার পর রন্ধনশালার আধিভৌতিক ভূগোলবিদেরা গণিতের তৃতীয় অক্ষাংশের পরা অপরা ব্রহ্ম পদার্থ নির্ণয় করছে

সেলিম মণ্ডল
বিবর্তন

একটা পরিত্যক্ত দাঁত পড়ে আছে।
জং-পরা।
খিদে ভুলে যাওয়া মানুষের দাঁত।
এ কীসের বিবর্তন! যে দাঁতের লাল ধুয়েও যায় না
সেই দাঁত কীভাবে পরা-পরম্পরা হয়ে
গেরস্থের স্বর্ণের মতো লাগে!

কোথাও কি বোতামের কারখানায় লেগেছে আগুন?

শিলাদিত্য হালদারের দুটি কবিতা
খাদ

খাদের এক কিনারায় দাঁড়িয়ে
এক ঝটকায় পা পিছলে হলাম ভারসাম্যহীন
এদিক ওদিক কোথায় গড়িয়ে যাচ্ছি
সারা শরীর আঘাতে ছিন্নভিন্ন, রক্তাক্ত
দীর্ঘশ্বাস বুক ধড়ফড়ানি ক্লান্ত অবসন্ন।

বিছানার চাদর ভিজে টুপটুপ
সিলিং ফ্যান নিশ্চল
লোমকূপ এখনো খাড়া
ফুরফুরে মহুয়ার মাদকতায় দেহ মন দিচ্ছে সাড়া
বসন্তের সকাল এ কেমন দুঃস্বপ্ন!

স্মৃতির আয়নায় ভেসে উঠল এক বিভীষিকা
ব্যাঙ্গাত্মক হাসিভরা মুখ
অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় দৃষ্টি
অতৃপ্ত এক ভালোবাসা যা পায়নি পূর্ণতা
হয়েছে নিষ্পত্তি খাদে।

শোঁ শোঁ ফ্যানের শব্দে নিজেকে সামলে নিতেই
চোখে পড়ল ঘরের কোণে কালো এক বিড়াল
মিউ মিউ করে জানান দিচ্ছে কলঙ্কের ক্ষণগুলো
অপেক্ষায় খাদের কিনারায় দেয় হাতছানি আজও সে অভিমানী।

আশ্চর্য! আমরা নাকি সভ্য

তোমার জঠরে জন্ম নিল যারা
আশা নিয়ে বাঁচবে বলে
ধরিত্রীর বুকে আঁকবে যারা
সভ্যতার সোপান মেলে
তারা আজ প্রায় বিলুপ্ত
ঢলে পড়েছে মৃত্যুর কোলে।

বিশ্বায়নের ইতিহাসে নাকি মানবসভ্যতার আগ্রাসন!
জিজ্ঞাসার মুখে জাতিসংঘ,
পশ্চিম আজ হয়েছে মুখর, দিচ্ছে আহ্বান
রুষ্ট প্রকৃতি মানবে কি ক্লাইমেট জাস্টিসের জ্ঞান?

শ্রেষ্ঠ জীব আজ কর্তব্য বিস্মৃত
প্রযুক্তির উল্লাস আর মুঠোফোনে উন্মত্ত
বিলীন হচ্ছে একে একে সৃজন অস্তিত্ব
আশ্চর্য! আমরা নাকি সভ্য।

ঢের হয়েছে নীতিজ্ঞান, আইনি পদক্ষেপ
সময় আসন্ন, প্রস্তুত হও, রেয়াত নেই আধুনিক প্রযুক্তির কাণ্ডারির
রাস্তার মোড়ে মোড়ে অক্সিজেন রিচার্জের আউটলেট–
আসছে সুদিন, সিলিন্ডার কাঁধে
ছুটছে মানব স্পেস স্টেশনে
বাকি আধখানা জীবন কাটাবে নূতন গ্রহের সন্ধানে।

মুস্তাফিজ শফি

সাপলুডু

আমি আজ যাবতীয় অহঙ্কার গচ্ছিত রাখলাম সেই ভাঁটফুল ফোটা বিকেলের কাছে। সেই নির্জন সন্ধ্যার কাছে। প্রণয়কাতর জোড়া শালিকের কাছে। ঝাউবনে জড়িয়ে গেলে ঘুম ওরা লুকায় মুখ নির্ভরযোগ্য গাছের খোড়লে। আর আমাদের গন্তব্য তখন ঝিঁঝিগান, লক্ষ্মীপেঁচার ডাক। গোপন আয়নাগুলো হয়তো এরই ভেতর হাতবদল হতে হতে দূর আকাশের তিমির।

মাঠজুড়ে মৃতঘাসের বুক বরাবর হাঁটতে হাঁটতে আমার পায়ে কেবলই স্পষ্ট হতে থাকে রক্তের দাগ। এভাবেই তবে ফেরে অনেকে রাতজাগা অন্ধকারে, পতনের শহরে।

আমি আজ পুনর্বার পাঠ করব জীবন, কুয়াশায় আকীর্ণ ধর্মগ্রন্থ। ভগ্নপ্রায় এই বাড়ির ছাদে মেজের ওপর মাদুর পেতে শুয়ে শুয়ে আমি আজ প্রার্থনার ভঙ্গিতে আকাশের দিকে তাকাব। অন্তর্গত দ্বিধাগুলোর সঙ্গে কথা বলব আর খেলব সাপলুডু।

প্রাণজি বসাক

খবর

হাতে আর কোনো গন্ধ বাকি নেই সব গন্ধ মুছে গেছে
আমি আর বুঝি আমি নই তুমি আর তুমি নও সংবাদ
হেডলাইন নিয়ে পতাকা ওড়ে পইপই পাড়ার বাতাসে
লোকজন মানুষজন মন্থর পায়ে ঘোরে ফেরে আনমনে
নয়নজুলিতে আটকে পড়া জলের মতন বেগহীন তুমি
নুইয়ে পড়ে শাপলা তোমার বুকে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বেলা
কত বেসুরো খবর জানাজানি হয় উঠোনের পারাপার
তুমি অটল বিশ্বাসে ঘুরে দাঁড়িয়ে গেয়ে ওঠো জয়গান
অদৃশ্যে পতাকা ওড়ে আকাশের বুকে চাঁদ ওঠে রাতে
মানুষের মুখে ফিসফিস করে অন্য এক ভাষার গান–

অর্ণব বসু

স্মরণযাত্রা

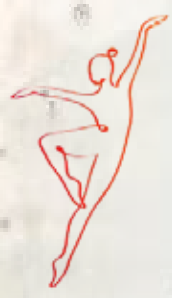

রুগ্ন দেহের পাঁজরার মতো ফেটে পড়ছে আকাশ–

গড়িয়ে পড়া আলো, কিছু দূর গড়াতে গড়াতে
কতদূর যাবে?

এত বছর পর–
পড়ন্ত বেলায়; দাদুর শরীরে শীত এলো।
হঠাৎ কী ভাবি, নতুন বস্ত্র পরিয়ে দিই

ওই তাঁর ময়মনসিংহ, ওই তাঁর নতুন বউ,
গলার ভেতর আটকে থাকা দুই বাংলার জল।

এত বৃষ্টি মাথায়
কেউ কী এগিয়ে দেবে তাঁকে?
পুরোন ভিটের পথে
অনন্ত বাতাস আটকে রয়েছে

আজ, এই পড়ন্ত বেলায়–
কালো দুইটা ফুসফুসের মাঝে
সামান্য পাখি এক, ছটফট করতে করতে
স্থির হয়ে যায় বুকের ভেতর!

তালাশ তালুকদার

তোমার দিকে তাকাইয়া আছি

মনে হচ্ছে তোমার দিকে আমার তাকাইয়া থাকাই সার

তোমার ঢোল অন্যে বাজায়

তোমার কথা ভাবতে ভাবতে
পিঠের ছাল উঠে রক্ত বাইর হয়

সময় সবাইকে সব পারা শেখায়
কিন্তু আমি সব কিছু শিখতে চাই না
শুধু তোমার গাছ বওয়াটাই শিখতে চাই

আমার কথা তুমি কি কিছু বুঝতেছ
নাকি অধিকাংশই ফেলে দিচ্ছ?

তোমার জন্য আমি দাঁড়ায়া আছি
তোমাকে আপন করে রাখার জন্য
মাথার ভেতরে কিছু জায়গাজমিও কিনে রাখছি

তার ভেতরে প্রবেশ করে
প্রতিদিনই তুমি হাঁটতে পারবা, পারবা খাইতে
প্রতিদিনের গোল তুমি প্রতিদিন পারবাও দিতে!

সারোক শিকদার

পূর্ণিমা

যেখানে কেবলা তার দিকে নিরিখ নাই, তড়পানো শুধু হাওয়ায় পাতা যেমন। নাম ধরে ডাক দিলে এমন কোনো নাম নাই–আমারেও চিনে যে দেয় সাড়া। নাই এমন গল্প কোনো যা প্রসন্ন করে সঙ্গ, দূরের চিলকে দেয় বিশ্রামের আশ্বাস!

যেই দিকে গেন্দাফুল, পা দুটো তার বিপরীত। ছয় বেয়ারার পালকি টেনে এই চিঠি নাও, যতদূর নিয়ে যাই–এরপর আর কোনো ছুমন্তর নাই, কালাজাদু নাই–কেবল হুহু দেওয়া, হাঁসুলির ভেতর পাক খায় অঘ্রাণ দুপুর। কিছু ছিল না খুব গভীর বুননে তবু হারাকিরি জাগে কিসে! নিজেরে খসখসে লাগে যেন কেউ ছুঁয়ে যায় নাই বহুকাল, ছুঁয়ে যাবে এমন কসমও কেউ কাটেনি কোনো কালে। ডাকেনি কেউ মন্ত্রমুগ্ধ স্বরে, রাখেনি কেউ ত্রিবেণীর ওমে–সরোবরে শূন্যতা কুড়ে খায় হায়ারোগ্লিফিক!

ছটফটানি, হাহাকার আর নিজেরে রাজহাঁস ভেবে আহত হওয়ার দিন, অনিবার্য সুন্দর হও। বৈশাখী জ্যোৎস্না ডাক দিলে, পেছনের মায়াসুতো টান দিলে সিনায়, সব ছিড়ে ডুব দেবো নির্বাণ পূর্ণিমায়।

দিপংকর মারডুক

সারাটা দুপুর

সারাটা দুপুর হাঁটব। যে যার মতন স্নায়ুবিকারের দিকে
তুমি ধ্বংসস্তূপে কাঁপাবে মেঘের তলদেশ কিংবা
রাতের বাগান থেকে সীমিত সুযোগের শালবন পর্যন্ত,
আজ এই বারুদের কামান–নির্ভয়ে পড়ে গেছে
বৃষ্টি, বৃষ্টি এবং বৃষ্টি হতে। তবু যেন মাটি তার অল্পঅনু;
শূন্য পারাপার ছেড়ে অনায়াসে যায় যোগাযোগের সাঁকোতে

তবে হে টলটলে পুকুর সবকিছু কী তোমার বেওয়ারিশ?
ধীরে ধীরে বাড়ো সবুজ অন্ধকার–তুমুল এবং অপ্রতিহত

এখন ক্রমাগত ধাতু, শোকের বহুমূত্র ফুল। শব্দ শেষে
চেয়েছিলে বিনীত চৈত্রের পুষ্পধার নাকি জলের মর্মতল
অথচ বাড়ি ছিলো অলক্ষ্যে : সেই গূঢ় ক্ষতির কচুরিপানা নিয়ে।

অনূদিত কবিতা

কুট্টি রেবতীর কবিতা

অনুবাদ : দিলারা রিঙকি

কুট্টি রেবতী (জন্ম ১৯৭৪) ভারতীয় কবি, গীতিকার ও একজন চিকিৎসক। তামিল ভাষায় প্রকাশিত তার ৩টি কবিতার বই Poonaiyai Pola (২০০০), Mulaigal (২০০২) ও Thanimaiyin Aayiram Irakkaigal (২০০৩)। ইংরেজি অনুবাদে তার প্রথম কাব্য Body's Door ২০০৭ সালে এবং Shattered Boundaries ২০১২ সালে দ্বিতীয়টি প্রকাশিত হয়। Panikkudam তার সম্পাদিত ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা। এটি প্রথম তামিল নারীবাদী পত্রিকা। তিনি ইন্ডিয়া টুডে থেকে সাহিত্যের জন্য Sigaram 15: Faces of Future award পান। পুরুষতান্ত্রিক সাহিত্যের আধিপত্য ও সমাজে নারীদেহকে যেভাবে নিগৃহীত করা হয় তার প্রতিবাদে বরাবরই তিনি সরব থেকেছেন

আধুনিক নারী কবিরা অভ্যন্তরীণ কম্পন সৃষ্টির ক্ষমতা নিয়ে কবিতা লেখেন। এ কম্পন বিভিন্ন উপায়ে উপলব্ধি করা যেতে পারে। মুক্তিকামী মনের কাছে তার স্বাধীনতার আনন্দকে বোঝাতে পারে। এ বিষয়ে তিনি জানান–লোকেরা সব সময় আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, কেন আমি সামাজিক উদ্বেগ ও সমস্যা নিয়ে কবিতা লিখি না। আমি আমার ভাষা ব্যবহার করি শুধু সেই শৃঙ্খলাগুলো খোলার জন্য যেগুলো একজন নারীর শরীরকে আবদ্ধ ও সংকুচিত করেছে। পারফর্মিং আর্টসের মতোই আমি কবিতা-নারীর সত্তায় প্রবেশ করতে পেরেছি।

কুট্টি রেবতী সিদ্ধ মেডিসিন ও সার্জারিতে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। যা তামিলনাড়ু থেকে উদ্ভূত বিশ্বের প্রাচীনতম চিকিৎসা ব্যবস্থাগুলোর মধ্যে একটি। মেডিকেল নৃ-বিজ্ঞানে ডক্টরেট গবেষণা চালিয়েছেন চেন্নাইয়ের মাদ্রাজ ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ থেকে। কুট্টি রেবতী বলেন–ভাষার সমৃদ্ধি, উচ্চারণ, স্বর, শৈলী, ফর্ম এবং আরও অনেক কিছুর জন্য সিদ্ধ ওষুধের শ্লোকগুলো তামিল ভাষার একটি বিরল ধন। আমি এই দেহ থেকে পাওয়া উপহারগুলো অনুভব করতে পারি। ভাষায় দৃঢ়তা ও ধারণার উর্বরতা–এখনও আমার ভেতরে মন্থন করে। আমি সেই প্রথম দিকের কবিতাগুলো লিখেছিলাম, এক এক করে শুধু কবিতার প্রতি ভালোবাসা থেকে। কবিতার যদিও একটি হিমায়িত আকার রয়ে গেছে, আবেগ দিয়ে ভাষাকে আকার দেয়া এবং একই সাথে আবেগকে পূর্ণ করে তোলে ভাষা। তদুপরি, একাট উপন্যাস বা ছোটগল্পের বিপরীতে একটি কবিতা শুধু একবারের পাঠেই তার অর্থ প্রকাশ করতে শুরু বরে না। একটি কবিতা মনের মধ্যে ঢুকতেও অনেক সময় লাগে, এছাড়া মনের দৃশ্যে যখন এটি স্তব্ধ হয়ে যায়, কবিতাটি নিজেকে প্রকাশ করে ছবির পর ছবি দিয়ে, যেন আবেগের একটি শক্তিশালী মূকাভিনয় হিসেবে। উপরন্তু, কবির মন থেকে যে শব্দ বের হয় তা তার রক্তের ছাপ নিয়েই বেরিয়ে আসে।

প্রথম ও দ্বিতীয় বই প্রকাশের মধ্যবর্তী সময়ে তিনি বিশ্বসাহিত্য নিয়ে ব্যাপক পড়াশোনা করেন। বিশ্বসাহিত্যের ক্লাসিক বিষয়গুলো তার মন মগজের রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটায়।

এন কল্যাণ রমন অনূদিত ইংরেজি থেকে কবিতাগুলো বাংলায় ভাষান্তরিত।

এই গ্রীষ্ম শুধু তোমার জন্যই নিয়ে এসেছি

তৃণভূমি শুকিয়ে গেছে
তুমি আজকাল চিঠি লেখ না
তোমার পত্রের মেজাজে
কান্নার শোরগোল,
দরদী শরীর
অনেক বাহু দিয়ে
আগলে রাখতে
আমাকে প্রস্তুত করে তোলে

গ্রীষ্মের রাস্তায় আর কেউ নেই
ডাকপিওন ব্যতীত
যে তার শ্বাসরোধ করা চিঠির ব্যাগ নিয়ে যাচ্ছে,
এবং যে মেয়েটি তার শৈশবের গোপনীয়তা হারিয়েছে
গ্রীষ্মের অদ্ভুত পাখি
নিঃশব্দে এসে, গপাগপ গিলে নিচ্ছে
সব ঝড়, শিলা জেগে ওঠছে
খেলবে না জানিয়ে দিচ্ছে শিশুরা
সূর্য এতই নিচে যে রোজ রক্তপানি শুকিয়ে আসে
শূন্য ঘরে
টেলিফোন বাজছে অনেকক্ষণ ধরে
মেয়েদের চোখ ভাসছে কুয়াশায়

গেলবার গ্রীষ্মে, আরও বেশি গরমে
গাছেদের জন্য মাটিতে দাঁড়ানো
আমার দেহকে তুমি এক জীবন্ত বিস্তৃতি বলেছিলে,
ঘুম থেকে জেগে, আমি খুঁজে পাই
সেই হাতব্যাগ, যেখানে
তোমার চুম্বনগুলো লুকিয়ে রেখেছিলাম
আর আমাদের ঝগড়াগুলো
কান্নার লবণে শুকিয়ে কাঠ হয়েছে,
এই গ্রীষ্মে নিভে যাওয়া প্রদীপের তীব্র গন্ধ
শুধু তোমার জন্যই হৃদয়ে বয়ে নিয়ে এসেছি,
আমাকে চিঠি দিয়ো, দিয়ো কিন্তু।

বিষণ্ন পাখিটা

গাছের ছায়া
বিষণ্ন পাখিটার মতো
এখনও বসে আছে ছাউনির নিচে

ছিনিয়ে নিয়ে
যেন সে রাস্তার দীর্ঘ নীরবতা বহন করতে চাইছে,
একটা মেয়ে নেমেছে ঝাড়ু দিতে

সে আমাকে অপেক্ষা করতে বলেছিল,
জানতে চেয়েছিল আমিও ভালোবাসি কিনা

ঝাড়ুদার মেয়েটি অনেক আগেই চলে গেছে,
সাথে নিয়ে গেছে তার না-বলা কথা, যখন
সে ফিরে ফিরে তাকাচ্ছে আমার দিকে

অন্ধকার কান্নার মতো ঝড় তুলতে শুরু করেছে
বিমোহিত আর ভীতিকর
শেষ অবধি পৌঁছানোর জন্য প্রস্তুত শরীরের মতো,
নিজের ফোটানো ফুলে, আমি অপেক্ষা করি

এখানে... সে আসে বহুদূর হেঁটে,
ভারাক্রান্ত মেঘের মতো ভারমুক্ত হতে
বৃষ্টি নিজেই
অবহনীয় আনন্দে,
শরীরে লাল নক্ষত্রের বসন্ত শুরু হয়েছে

যদিও গাছটি,
এখন পর্যন্ত, একটুও বিচলিত নয়–
বিষণ্ন পাখিটার মতো

সমরেশ মজুমদার (১০ মার্চ ১৯৪২ – ৮ মে ২০২৩)

সমরেশ মজুমদার
সম্মোহনী ভাষার কথক

গৌতম গুহ রায়

প্রয়াণ

চলে গেলেন সমরেশ মজুমদার। ডুয়ার্সের গয়েরকাটা চাবাগান থেকে যে জীবনের যাত্রা শুরু হয়েছিল সেই গোটা জীবন ডুয়ার্সের স্মৃতি বহন করেছেন, অক্ষরের বুননে সেই স্মৃতিকথা রেখে দিয়ে কথোয়ালের যাত্রা শেষ হলো নগর কলকাতায়। সমরেশ মজুমদার, দুই বাংলার অন্যতম জনপ্রিয় সাহিত্যিক, প্রয়াত হলেন ওপারের ২৫শে বৈশাখ, শেষযাত্রা হলো এপারের ২৫শে বৈশাখ। ২৫শে এপ্রিল থেকে কলকাতার এক বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণের কারণে। সোমবার, ৮ মে বিকেল ৬টা নাগাদ তাঁর প্রয়াণ ঘটে।

১৯৪৪-এর ১০ মার্চ, বাংলার ২৬শে ফাল্গুন ১৩৪৮ সালে জন্মেছিলেন, তখন দেশজুড়ে স্বাধীনতা আন্দোলনের জোয়ার। উত্তরের চা-বাগানের শ্রমিক মহলেও সেই ঢেউ এসে পড়ছে, এর কিছুদিনের মধ্যেই 'তেভাগা আন্দোলন' এ এক ভিন্ন মাত্রায় বিকশিত হচ্ছে ডুয়ার্সের চা-বাগান বলয়ে। এই আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশের মধ্যেই সমরেশ মজুমদারের শৈশব কাটে

১৯৫০-এ
সমরেশ মজুমদার

জলপাইগুড়ি জেলার চা-বাগান অঞ্চল– ডুয়ার্সের গয়েরকাটা চাবাগানে, ডুডুয়া, আংরাভাষা গিলান্ডি নদী, আধো পাহাড় আধো অরণ্যের সবুজ, দিগন্তবিস্তৃত চাবাগান ও ফাঁকা প্রান্তর। দাদু পূর্ণচন্দ্র মজুমদার ছিলেন গয়েরকাটা চা-বাগানের বড়বাবু, এই দাদুর ভূমিকা তাঁর জীবনে অসীম। বাবা কৃষ্ণদাস মজুমদার ছিলেন ওই বাগানেরই গুদামবাবু। এই চাবাগানের কোয়ার্টারেই জন্মেছিলেন সমরেশ মজুমদার। পরবর্তীতে ছাত্রজীবন কেটেছে জলপাইগুড়িতে, জেলা স্কুলে। তখন তাঁর বাবা কৃষ্ণদাস মজুমদার জলপাইগুড়ি শহরের তিস্তাপারের হাকিমপারায় বসত গেড়েছেন। এরপর উচ্চশিক্ষার জন্য কলকাতা যাত্রা, স্কটিশচার্চ কলেজ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে পড়াশোনা। লেখালেখি চলছে। কলেজেই নাটকের সঙ্গে জড়িয়ে যাওয়া। নাট্যকার হিসেবে শুরু করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু জীবন অভিজ্ঞতা তাঁকে গল্পকার বানিয়ে দিলো। চারপাশের চরিত্র ও ঘটনাগুলোর কথা বলার নেশায় হয়ে উঠলেন 'কথোয়াল'। আত্মকথায়, আলাপচারিতায় বলেছেন যে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের লেখা থেকে অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন যে 'শুরু করা উচিৎ চূড়া থেকে'। তাই তাঁর অভীষ্ঠ সেই 'চূড়া' দেশ পত্রকায় গল্প পাঠান। কিন্তু পিয়নের ভুলে সেটি মনোনীত হয়েও ফিরে আসে। ১৯৬৭ সালে সেই গল্প 'অন্তরআত্মা' 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এরপর ক্রমশ গল্প লেখার নেশা তাঁকে চেপে ধরে।

কলকাতার নাগরিক জীবনে ক্রমশ অভ্যস্ত হতে থাকা সমরেশের বুকের ভেতর জেগে ছিলো তাঁর শৈশব ও কৈশোরের ডুয়ার্স, জলপাইগুড়ি, নকশালবাড়ি, ডুয়ার্সের নদী, চাবাগানের মানুষজন, তিস্তা নদী। এই স্মৃতি তাঁর গল্পে রসদ যোগান দিতে থাকে। গল্প বলার জাদুকরি কলম নিয়ে একের পর এক গল্প লিখে যেতে থাকেন, একদিন সেই কলমই তাঁকে সর্বক্ষণের লেখক করে তোলে। সমরেশ মজুমদারে এই প্রবল জনপ্রিয়তার প্রধান কারণ ছিলো তাঁর অসাধারণ গল্প বলার দক্ষতা। ভালোবাসার গল্পকথা বা রহস্যোপন্যাস–সবটাই নিখুঁত সম্মোহনী ভাষায় বলে যেতেন তিনি। গল্প থেকে উপন্যাসে চলে আসতে খুব একটা সময় লাগে না তাঁর। ১৯৭৫-এ সেই 'দেশ' পত্রিকায় তাঁর প্রথম উপন্যাস 'দৌড়' প্রকাশিত হয়। এরপর এখানেই একের পর এক উপন্যাস প্রকাশিত হতে থাকে। সত্তরের উত্তাল সময়কে তিনি পটভূমি হিসেবে বেছে নেন। 'ট্রিলজি' লিখতে শুরু করেন। প্রথমে 'উত্তরাধিকার', এরপর 'কালবেলা', 'কালপুরুষ' এবং অন্তিমে 'মৈষলকাল'। ডুয়ার্সের শান্ত ও সবুজ নিরিবিলি জনপদ থেকে নগর কলকাতা পদার্পনের স্মৃতি ও কষ্ট কোথাও তিনি যত্নে রেখে দিয়েছিলেন। 'দেশ' পত্রিকায় 'উত্তরাধিকার' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাসের লিখবার কথা প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন যে সাগরময় ঘোষ তাঁকে পরামর্শ দিয়েছিলেন, 'নিজেকে নিয়ে লেখো। তোমার জীবনী নিয়ে ইন্টারেস্টেড নই, জীবনে যাঁদের দেখেছো, তাঁদের নিয়ে গপ্পো তৈরি করো'। এই 'ট্রিলজি'তে আমরা সমরেশ মজুমদার ও তাঁর দেখা মানুষদের, ঘটনাগুলোকে তাঁর মতো করে দেখতে পাই। 'উত্তরাধিকার' এ অনিমেষ কলকাতায় পড়তে এসেছেন, সমরেশও তাই। শৈশবের আংরাভাষা নদী, জলপাইগুড়ি শহর, গয়েরকাটা চাবাগান (গয়ের-স্বর্গ। স্বর্গছেড়া), খুট্টিমারি জঙ্গল , বাস্তবের 'ভূমি' তাঁর লেখার 'জমিন' দখল করে থাকে।

দৌড়-এর উৎসর্গের পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছিলেন '... মাছেরা কি ঝরনার কাছে ঘুরে ফিরে কৃতজ্ঞতা জানায়? / কি জানি। শুধু জানি # / ওদের জলজ বলা হয়ে থাকে ...'।

সমরেশ মজুমদার নেই এই খবরটা শুনবার পর থেকে এই কথাগুলোই মনের মধ্যে, কানের পাশে, ঘুরঘুর করছে। জিলা স্কুলে পড়বার সময় তাঁকে অভিভাবকসম স্নেহ দিয়েছিলেন সেইসময়ের শিক্ষক কবি বেণু দত্তরায়, এই কারণে আলিপুরদুয়ার বা পরবর্তীতে জলপাইগুড়ি এলেই একবার অন্তত দেখা করতে ছুটতেন তাঁর বাল্যকালের শিক্ষকের কাছে। আর একজন মানুষের প্রতি চিরজীবন ঋণী ছিলেন বলে উল্লেখ করেছেন তিনি তাঁর গৃহশিক্ষক সতী সেনগুপ্ত। ময়নাগুড়ি থেকে ষাটের দশকে 'পাবক' বলে একটি কবিতার কাগজ করতেন কবি সতী সেনগুপ্ত। কবিদের মিছিল করেছিলেন সেই সময় ময়নাগুড়ির মতো গ্রামীণ শহরে। সাহিত্য একাডেমি পেয়েই সমরেশ মজুমদার ডুয়ার্সে ছুটে আসেন, তখনো সতী সেনগুপ্ত জীবিত। তার বাসায় গিয়ে প্রণাম করে আসেন। গদ্যকার সমরেশ মজুমদারের সাহিত্য জীবনের সূচনার ভিত তৈরি হয়েছিলো দুই কবির হাতে। তাই হয়তো, 'উত্তরাধিকার'-এ অনিমেষের মনে বিপ্লবের ছোঁয়া জাগানো সুনীল রায়ের সঙ্গে তার সম্পর্ক গড়ে ওঠা, সমাজটাকে পালটে দেওয়ার স্বপ্ন জাগানোর ক্ষত্রে অনুঘটক হিসেবে কবিতাকে রেখেছিলেন সমরেশ। বই নিয়ে কথা প্রসঙ্গে জয়াকে অনিমেশ জানিয়েছিলো রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়ার কথা। সুনীল দা সুকান্ত প্রসঙ্গে বলেন–'সুকান্ত হল কবি, নবজাগরণের কবি। ওর কবিতা পড়লে রক্ত টগবগ করে ওঠে।' এ কথার পর অনিমেষের রবীন্দ্রনাথের কবিতার কথা মনে পড়ে যায়। এভাবেই কবিতাকে রেখে দেন গদ্যের নকশিকাঁথার ভেতর।

১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮, সেবার তিনি রাজি হলেন তাঁর কৈশোরের শহরে আসতে। ফণীন্দ্রদেব বিদ্যালয় তার শতবর্ষ উদযাপনের অঙ্গ হিসেবে বইমেলা করেছিলো, তিনি সেই বইমেলার উদ্বোধক ছিলেন। তিনি এলেন, এবং দুদিন ধরে মাতিয়ে রাখলেন, আড্ডায়, কথায়, ভালোবাসায়। আমরা অবাক হয়ে দেখেছিলাম কিছুদিন আগেই মৃত্যুমুখ থেকে ফিরে আসা, স্মৃতি হারিয়ে যাওয়া মানুষটা তাঁর যাবতীয় অসুস্থতা কিভাবে ঝেড়ে ফেলে দিয়েছেন। এই প্রবল জীবনীশক্তির মানুষটা অবশেষে হেরে গেলেন মৃত্যুর কাছে, ১৯৪৪ থেকে ২০২৩-৭৯ বছরের রঙিন যাত্রা শেষ হলো।

গয়েরকাটার বন্ধু বিকাশ, তাঁর কবিতার বই 'কনিষ্কের মাথা' জলপাইগুড়ি থেকে প্রকাশিত হয়েছিলো, তখনও সে ও আমি স্কুল ছাত্র। একদিন বিকাশের গয়েরকাটার বাসায় হাজির হলাম। অনেক টানের একটা ছিলো সমরেশ মজুমদারের শৈশবের, তাঁর আখ্যানের মাটির গন্ধ নেওয়া। বিকাশ তখনই দুর্দান্ত কবি ও সম্পাদক। আমাদেরও মাথায় সাহিত্যের ভূত চেপেছিলো, সমরেশ মজুমদার তখন কলকাতা নিবাসী, কিন্তু মাঝে মাঝেই আসেন গয়েরকাটা, জলপাইগুড়ি। তাঁদের হাকিমপাড়ার বাড়িতেও বছরে দুই-তিনবার আসতেন, বিশেষ করে পুজোর সময়। সমরেশ মজুমদার এই বাড়ির কথা প্রসঙ্গে লিখেছেন, '...আমাদের বাড়ি ছিল তিস্তা নদী থেকে বড় জোর দেড়শো গজ দূরে। বন্যা না হলেও নদীতে জল বাড়লেই তা ঢুকে পড়ত আমাদের বাগানে। একটা মজা হত তখন, সেই জলে সাঁতরে আসত বোরলি আর ট্যাংরা মাছ। এই ট্যাংরা মাছগুলোকে আমি এখন পর্যন্ত জলপাইগুড়ির বাইরে দেখিনি। আর বোরলি তো জলপাইগুড়ির গর্বের মাছ। যেই তিস্তার জল কমতো অমনি আমরা নেমে পড়তাম বাগানে।

ঘাসে, গাছের গোড়ায় থাকত বোরলি আর ট্যাংরাগুলো। ... শুধু বাগানের ধরা মাছ নয়, তিস্তার জল বাড়লে বাজার থেকে মাছ কেনা হত না। এসবের পেছনে ছিল ওই খাটা পায়খানার ভূমিকা। এখন ভাবি, যেসব কর্মীরা মলের টিন বয়ে নিয়ে যেতেন তাঁরা যদি নারাজ হতেন তাহলে শহরের মানুষদের কি অবস্থা হতো? নাকে গামছা বেঁধে ওই মানুষগুলো কাজ করেছেন বলে শহরটা রক্ষা পেয়ে গিয়েছিল। অভাব কতটা তীব্র ছিল যে তার মোকাবিলা করতে মানুষকে অমন ভয়ঙ্কর কাজ করতে হয়েছে'। এই স্মৃতিকথাতেও সমরেশ মজুমদারের স্পর্শকাতর মানবিক মনের চিহ্ন ভেসে উঠেছে। এই মানবিক মনই একদিন তাঁকে কাহিনিকার হিসেবে গড়ে তুলেছিলো। এই প্রসঙ্গেই তাঁর প্রথম উপন্যাস 'দৌড়' লেখার কথা উল্লেখ করা যায়। সমরেশের বয়স তখন তরুণ। লেখালেখি শুরু করেছেন, অগ্রজ লেখকদের সঙ্গে আড্ডা দিতে চৌরঙ্গী যান। একদিন একটু আগেভাগেই হাজির, তখন সেই আড্ডায় অগ্রজ লেখক বরেণ গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন, অন্যেরা আসেননি তখনও। বরেণ গঙ্গোপাধ্যায়ের হাতে একটা হলুদ রঙের পাতলা বই। বরেন বাবুরা কোথাও একটা যাওয়ার তোড়জোড় করছেন, সমরেশও সঙ্গে যেতে চাইলে নিমিরাজি বরেণ বাবুরা তাঁকে নিয়ে গেলেন। ট্যাক্সি এসে রেসের মাঠের সামনে দাঁড়াল। অবাক বিস্ময়ে সমরেশ দেখলেন তাঁর শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিকেরা রেস খেলেন! মাঠে দেখলেন প্রেমেন্দ্র মিত্রও হাজির, দেবব্রত বিশ্বাস রেসের গ্যালারিতে বসে আপন মনে রবীন্দ্র গান গাইছেন। অবাক বিস্ময়ে বছর ছাব্বিশের সমরেশ এসব দেখছেন। ঘোরাদৌড় দেখতে দেখতেই তিনি দেখলেন একটা ঘোরা পড়ে গেল। রেসের দৌড়ে সেই ঘোড়াটি হেরে গেলো। রেসের কর্তারা সেই আহত ও পরাজিত ঘোড়াটিকে সবার সামনেই গুলি করে মেরে ফেলল। রেসের এটাই নিয়ম। দৃশ্যটা সমরেশের স্পর্শকাতর মনে একটা গভীর ক্ষত তৈরি করল। এখান থেকে ফিরেই তাঁর মনে জন্ম নিলো 'দৌড়'-এর প্লট। সংবেদনশীল ও মানবিক কথোয়ালের এক স্বতন্ত্র যাত্রা সূচিত হলো। আমাদের সেই কিশোরকালে অনিমেষ মাধবীলতার প্রেমে পড়া অনেক কিশোরের মতো আমার কাছে সমরেশ মজুমদার এক উজ্জ্বলতর তারকা। পুজোর লেখালেখি শেষ করে এখানে আসতেন, এই উত্তরভূমির অবকাশ তাঁর বিশ্রামকাল। ১৯৭৮-৭৯, আমি তখনো স্কুলছাত্র, সদ্য একটা লিটল ম্যাগাজিন বের করি আর কবিতা যাপনের নেশায় আক্রান্ত হয়ে বুঁদ হয়ে আছি। জানি না কেন সেই স্কুলছাত্রটিকে স্নেহ করতেন তিনি, রাকেশ-অনিমেষ-মাধবীলতা-অর্জুনের স্রষ্টা। টাউনক্লাব স্টেডিয়ামের উত্তরের সাদা রঙের সেই বাড়িটার বারান্দায় একটা বেতের 'ইজি চেয়ার' ছিলো। তিনি এসে চায়ের কাপ নিয়ে বসতেন, একের পর এক জিজ্ঞাসা ছুড়ে দিতাম তাঁকে। তিনি হাসতে হাসতে তাঁর উত্তর দিতেন। অনেকটা জায়গা নিয়ে ছিলো 'উত্তরাধিকার'-এর চরিত্ররা। অনিমেষ, তার প্রেম, সাইকেলের ঘন্টি বাজানো কিশোর থেকে সেই স্বর্গছেড়া চাবাগান। একদিন সকালে হাঁটতে হাঁটতে জিলা স্কুলের সামনের বাঁকটা পার হয়ে একটা বাড়ির সামনেটা দেখিয়ে বললেন, 'ধরো এই পথ দিয়েই অনিমেষ সাইকেল নিয়ে ঘুরছে, ওখানে বিরাম করের বাড়ি, ওইখানে সেই মেয়েটি থাকে'। কথায় কথায় গয়েরকাটা চাবাগানের কথা উঠে আসতো, স্বর্গছেড়া তো তাঁর গয়েরকাটাই। ডুয়ার্স, চাবাগান তাঁর চেতনার গভীরে ঢুকে ছিলো। 'উত্তরাধিকার' 'কালবেলা' ও অজস্র আখ্যানের নানা জায়গায় তার চিহ্ন রয়ে গেছে। শুরুতেই তিনি টেনে নিয়ে যান তাঁর 'জায়গা জমিনে'। 'শেষ বিকেলটা অন্ধকারে ভরে আসছিল। যেন কাছাকাছি কোথাও বৃষ্টি হয়ে গেছে, বাতাসে একটা ঠান্ডা আমেজ টের পাওয়া যাচ্ছিল। অবশ্য ক'দিন থেকেই আকাশের চেহারাটা দেখবার মতো ছিল। চাপ-চাপ কুয়াশার দঙ্গল বাদশাহী মেজাজে গড়িয়ে যাচ্ছিল সবুজ গালিচার মতো বিছানো চা-গাছের ওপর দিয়ে খুটিমারির জঙ্গলের দিকে। বিচ্ছিরি, মন খারাপ করে দেওয়া দুপুরগুলো গোটানো সুতোর মতো টেনে টেনে নিয়ে আসছিল স্যাঁতসেঁতে বিকেল–ঘষা সেলেটের মতো হয়েছিল সারা দিনের আকাশ। বৃষ্টির আশঙ্কায় প্রত্যেকটা দিন যেন সূচের ডগায় বসে থাকতো এই পাহাড়ি জায়গাটায়, কেবল বৃষ্টিটাই যা হচ্ছিল না।' আসলে ডুয়ার্স, চাবাগান, ডুয়ার্সের নদী তার মজ্জায় ঢুকে ছিলো। তাই তার প্রকাশ গোটা 'সমরেশ সাহিত্য' জুড়ে। তাই 'নদী বন্ধ হয়ে যাওয়া'র কথা পাই, ডুডুয়া, কালবোস মাছ তার সাহিত্যে ঢুকে থাকে। তিস্তা সেতুর আগে, ১৯৬৮র বন্যার আগে তিস্তার চর দিয়ে পারাপারের ভরসা ছিলো চর ট্যাক্সি। সেই চর ট্যাক্সির কথা তিনি ভোলেননি। আজীবন তিনি স্মৃতি নিয়েই তো গল্প বলে গেছেন, গল্প বলাটাই ছিলো মুখ্য, সাহিত্য কতোটা ধ্রুপদী হলো তা নিয়ে তাঁর মাথাব্যথা ছিলো না। 'দৌড়' তাঁর প্রথম উপন্যাস, সেখানে কেবলই নাগরিক জীবনের আর্তনাদ, কিন্তু তিনি যখন 'নিজের দেখা মানুষগুলো ও ঘটনার আখ্যান লিখতে বসলেন তখন তাঁর যাপনজুড়ে থাকা ডুয়ার্স, জলপাইগুড়ি সেই কথার মাঝে স্থায়ী আস্তানা করে নিলো। 'উত্তরাধিকার'-এ আমরা বারংবার দেখি গয়েরকাটা-জলপাইগুড়ি-তিস্তা-ডুডুয়া। 'শীতকালে জলপাইগুড়িতে হঠাৎ হঠাৎ বৃষ্টি আসে। এসে ঠান্ডাটাকে বাড়িয়ে দিয়ে যায়। যে সমস্ত মানুষ জরায় থিতোচ্ছিল তারা টুপটাপ চলে যায় এ সময়। তিস্তার তখন টানের সময়। শীতের দাপটে ক্রমশ কুঁকড়ে যাচ্ছে নদীটা। তবুও জল এখনও টলটলে। স্রোতের ধার নেই, যৌবন ফুরিয়ে যাওয়া মহিলার মতো শুধু জাবর কেটে যাওয়া। বাঁধ প্রায় সম্পূর্ণ। ওপাশে সেনপাড়া ছাড়িয়ে তিস্তার বুকের ওপর পুল বানাবার কথাবার্তা চলছে। কলকাতা থেকে সরাসরি ট্রেনে বাসেয়াসাম যাওয়া যাবে। পক্ষিরাজ ট্যাক্সিগুলো গা-গতর ঝেড়ে মুছে এই কটা বছর কিছু কামিয়ে নেবার জন্য কিংসাহেবের ঘাটের দিকে আসবো আসব করছে। এই সময় সন্ধ্যে থেকেই আকাশ কাঁপিয়ে বৃষ্টি নামল।' (পৃ. ২০৬) বুকের গভীরে অটুট স্মৃতি ও ভালোবাসা না থাকলে এভাবে লেখা যায় না। যে বুক অনন্ত রোম্যান্টিক।

আমাদের সেই কিশোরকালে অনিমেষ মাধবীলতার প্রেমে পড়া অনেক কিশোরের মতো আমার কাছে সমরেশ মজুমদার এক উজ্জ্বলতর তারকা। পুজোর লেখালেখি শেষ করে এখানে আসতেন, এই উত্তরভূমির অবকাশ তাঁর বিশ্রামকাল। ১৯৭৮-৭৯, আমি তখনো স্কুলছাত্র, সদ্য একটা লিটল ম্যাগাজিন বের করি আর কবিতা যাপনের নেশায় আক্রান্ত হয়ে বুঁদ হয়ে আছি

'সমরেশ মজুমদার আর নেই' এই খবর পেয়ে কিছুক্ষণের জন্য সেই এলাকাটা ঘুরে আসার ইচ্ছে করছিলো, যেখানে তাঁদের বাসা ছিলো, এখন আমারই এক বন্ধু তিনতলা বাড়ি করেছেন। সেখানে দাঁড়িয়ে যেন চোখের সামনে ভেসে উঠল সেই 'উত্তরাধিকার'–তারপর আঁচল দিয়ে জিমির লালা বুক থেকে মুছে বললেন, 'তোমরা কোথায় থাকো?' 'টাউনক্লাবের কাছে।' অনিমেষ বলল। 'ওমা তাই নাকি ! একই পাড়ায় আছি এতদিন তোমাকে দেখিনি ! তোমরা কয় ভাই বোন?' 'আমার ভাই বোন নেই, দাদু পিসিমার কাছে থাকি।' 'কেন, তোমার বাবা মা?' 'বাবা স্বর্গছেড়া চা-বাগানে আছেন।' ... এরপর অনিমেষের মন উথালপাথাল করা 'দর্শন'। সমরেশের পাঠককুলের একটা বড় অংশ ছিলো তরুণ-তরুণী, যারা এই ভালোবাসার গল্পের টানে অন্তর থেকে নিয়েছিল, তাঁকে বাণিজ্যিকভাবেও সাফল্য এনে দিয়েছিল।

সমরেশ মজুমদারকে নিছক সাহিত্যিক হিসেবে দেখলে তাঁর গোটা ছবিটা পাওয়া যাবে না। অনেকেই বলেন যে ডুয়ার্সের বাতাসে 'রোম্যান্টিক আলো' ঘুরে বেড়ায়, এখানে যারা বড় হন তাদের গায়ে সেই আলো মাখামাখি হয়ে থাকে। এই রোম্যান্টিসিজমে সামাজিক শোষণের থেকে বেরিয়ে আসার বার্তা থাকে, বিপ্লবের গল্পকথা থাকে। সমরেশ মজুমদার একজন যুবকের স্মৃতি নিয়ে দেখেছেন সত্তরের নকশাল আন্দোলন, তার সেই দেখা তাঁর মতো করে, তীব্র এক রোম্যান্টিকতায় এঁকেছেন। এই আখ্যান তার অন্তর থেকে আসা। পক্ষে বিপক্ষের যুক্তি পাল্টা যুক্তিকে পাশ কাটিয়ে যাননি। অনেকবার এই নিয়ে খোলামেলা কথা হয়েছে। বিপ্লবের ওই পথকে বিশ্বাস করতেন না, কিন্তু সামাজিক পরিবর্তনের প্রয়োজনকে বিশ্বাস করতেন। তাঁর 'ট্রিলোজি'র অনেকটা জুড়েই তাঁর দেখা সত্তরের

রাজনৈতিক ঘটনাবলি, নকশাল আন্দোলন। সমরেশ মজুমদারের নিজের কথায়, 'আমি সেই জীবন-যাপন করিনি, তবে দেখেছি। আমার সেই বন্ধুরা প্রবল দমন-পীড়নের মধ্যে ছিলো। অনেকেই দেশ থেকে পালিয়ে যায়, অধিকাংশ জেলে, একাংশ আত্মগোপন করেছিলো। জীবনে প্রেম একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, কিন্তু এই বন্ধুরা পিছুটানমুক্ত থাকার জন্য প্রেমের ডাককে এড়িয়ে যেত। কারণ তারা জানত, প্রেম মানে পেছনে টানা। প্রেম মানে ঘরের বাঁধন। এমন পরিস্থিতির মধ্যে 'কালবেলা' লিখি আমি। নকশালবাড়ি আন্দোলনটা কি ছিলো? এই বিষয়ে আমি অনেক বিখ্যাত নকশালবাড়ি নেতার সঙ্গে আলোচনা করেছি। কিন্তু তাঁরা আমাকে তৃপ্ত করতে পারেনি। কারো সঙ্গে কারো কথা মিলছে না, আমি কথার গড়মিলে দ্বন্দ্বে পড়েছি। শুরুর দিকে সাধারণ মানুষের একটা সমর্থন ছিলো। একসময় তারা ভেবেছিলো–এই দামাল ছেলেগুলোই মুক্তি আনবে, দেশ ও দশের। কিন্তু এঁদের পথ হঠাৎ ব্যক্তি হত্যা, পুলিশ হত্যার দিকে ঘুরে গেলো, বিদ্যাসাগরসহ মনীষাদের মূর্তি ভাঙতে লাগল। মানুষ আস্থা হারিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলো। কালবেলায় দেখি সেই কথারই প্রতিধ্বনি–'অনিমেষের ভুল ভাঙল একসময়। যেটা করেছে সেটার জন্য দেশ তৈরি ছিল না। আন্দোলনের সময় যে বন্দুক নিয়ে লড়াই করতে যাচ্ছে, জানি না সে বন্দুকের ভিতর গুলি ছিল কি না। এমন একটা পরিবর্তনের জন্য দেশ তৈরি নয়। আমাদের মধ্যে কয়েকজনের ভেতরে যে আগুন আসছে সেটা সারাদেশের মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পারব না। এই ভ্রান্তিটা তো, এক সময় ভাঙল।' আমরা তাঁর 'কালবেলা' উপন্যাসে সমরেশ মজুমদারের একথারই প্রতিধ্বনি দেখি, 'জলপাইগুড়ি শহর থেকে সেই প্রথমবার ট্রেনে চেপে আসবার সময় ভারতবর্ষের মাটিতে নতুন কিছু গড়ার জন্য যে ভাংচুর শুরু হয়েছে বলে উত্তেজনায় টগবগে হয়েছিল সে, এই কয় বছরে তা কোথায় মিলিয়ে গেছে। এখন এই শহরের মানুষগুলোর দিকে তাকালে মনে হয় না তারা বা তাদের কেউ কেউ ও সব কথা কখনও ভেবেছেন। ...'

রাজনৈতিক বিশ্বাসে ছিলেন নিজের প্রতি প্রবল আস্থাশীল। কোনো প্রাতিষ্ঠানিক বা দলীয় রাজনীতি বা ক্ষমতার কাছে প্রণত হননি। সে বাম জমানায় হোক বা মমতা জমানায় হোক। স্বচ্ছ ও দলীয় আনুগত্যমুক্ত নিরপেক্ষতাকে গুরুত্ব দিয়েছেন। ২০১১-এর ফেব্রুয়ারিতে ঢাকায় সফরে যান তিনি। সেই সময় ফরিদ কবির ও সাখাওয়াত টিপু সমরেশ মজুমদারের একটি সাক্ষাৎকার নেন। সেখানে তিনি পরিষ্কারভাবে বলেন যে, 'মানুষকে ভাগাভাগি করা হয় রাজনৈতিকভাবে। এটা তো হওয়ার কথা ছিলো না। এই যে বন্যা হলো, সেখানেও রিলিফ নিয়ে রাজনীতি হলো। ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলকে ভোট দিল, আর কে দিল না। ... এই রাজনৈতিক দ্বিচারিতার কারণে তখন বিরূপ ভাবনা এলো। পশ্চিমবাংলাজুড়ে খাদ্যাভাব চলছে। আন্দোলন হচ্ছে। পুলিশ লাঠিচার্জ করছে। তখন কলকাতায় হরতাল চলছে। বিক্ষোভকারীরা ট্রাম বাস পোড়াচ্ছে। পুলিশ বলছে, 'জাতীয় সম্পদ রক্ষা করতে, জান-মাল বাঁচাতে যারা ট্রাম-বাস পোড়ায় তাদের গুলি করা হবে।' যার ফলে সেদিন পুলিশের গুলিতে লাশ পড়ে। আমিও ছিলাম সেদিন। আমি বেঁচে গিয়েছিলাম। লাশ নিয়ে টানাটানি হলো। মিছিলকারীরা ভাবল তাদের দলের লোক। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, ছেলেটা কে? আমি কে? এটা একটা গ্রেট প্রশ্ন। ওই যে ছেলেটা রাজনীতির শিকার হয়ে সতেরো বছর বয়সে জীবন দিয়ে দিলো, এটা একটা মারাত্মক ঘটনা। সে কে? এই প্রশ্নটার উত্তর খুঁজতে খুঁজতে আমি ভাবলাম, ছেলেটা বেঁচে গেছে।'

নিজে প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক দল বা কর্মসূচি থেকে শতযোজন দূরে থাকতেন। কিন্তু রাজনৈতিক চেতনা থেকে দূরে থাকেননি। তিনি মনে করতেন সতীনাথ ভাদুড়ীর 'জাগরী' পৃথিবীর সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। 'এটি পুরোপুরি রাজনৈতিক লেখা, আমার মতে, বাংলা ভাষায় একমাত্র রাজনৈতিক উপন্যাস। আসলেই রাজনৈতিক উপন্যাস। আসলেই রাজনীতি আমাদের জীবনের সাথে মিশে আছে। এমন কি আমাদের বাঁচার জন্যই রাজনীতির দরকার আছে।'

দেশভাগ প্রদত্ত 'সীমান্ত'র 'অন্যদিকে', বাংলাদেশে যখন জাতীয় সঙ্গীত প্রণেতা রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন উদযাপন হচ্ছে সেই সকালেই চিরবিদায় নিলেন সমরেশ মজুমদার, দুই বাংলার অন্যতম জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক। প্রথমবার মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসে তিনি লিখেছিলেন স্মৃতিজাগানিয়া নভেলেট 'বুকের ভেতর বাংলাদেশ', ২০০৪-এ। ১১২ পৃষ্ঠার এই বইটিতে জড়িয়ে আছে তাঁর ভেতরে থেকে যাওয়া দেশভাগের অনুভূতি, যন্ত্রণা, আক্ষেপ, প্রত্যাশা। গল্পের থেকে বেরিয়ে গিয়ে অনুভূতির কথা টেনে এনেছেন, এই নভেলেটের সূচনাপর্বে পঁচাত্তর বছর বয়সী প্রশান্ত মুখার্জী বলছেন– 'আমার জন্মভূমি দেখতে চাই। পৃথিবী থেকে চলে যাওয়ার আগে এটাই আমার শেষ ইচ্ছে।' এমন ইচ্ছাটা এই খণ্ডিত বাংলার উদ্বাস্তু প্রজন্মের অন্তরের কথা। সমরেশ মজুমদার বাংলাদেশ ঘুরে আসার অনুভব এই রহস্য উপন্যাসে স্বপন দত্তের বয়ানে লিখে রাখেন– 'হিন্দু-মুসলমান ব্যাপারটা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। আমি একজন হিন্দু। আর পাঁচজনের মতো স্বাভাবিক জীবনযাপন করি। আমার বেশিরভাগ বন্ধুই মুসলমান। কিন্তু আমাদের কথা বলার এত বিষয় আছে যে ধর্ম নিয়ে কথা বলি না। এখানে দুর্গা পুজোর সংখ্যা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। রোজার সময় ইফতারের নেমন্তন্ন খেতে খেতে পেট ভরে যায়। ... আপনি হয়তো জানেন না বাংলাদেশের মানুষ রবীন্দ্রনাথকে যে পরিমাণ শ্রদ্ধা করে, তাঁকে যেভাবে স্মরণ করে আপনারা তার শতকরা দশভাগও করেন না। অথচ দুই দেশের জাতীয় সঙ্গীত তাঁর রচনা।' সমরেশ মজুমদার প্রয়াত হলেন ওপারের ২৫শে বৈশাখ, শেষ যাত্রা হলো এপারের ২৫শে বৈশাখ।

গত মাসে একবার ফোনে তার সঙ্গে কথা হলো, বারে বারে বলছিলেন এই ডিসেম্বরে আসবেন এই তাঁর লালন ভূমিতে। কদিন নিরিবিলিতে ডুয়ার্সে কাটাবেন, এরপর দুদিন জলপাইগুড়ি শহরে। আমাদের যাবতীয় স্বপ্ন ও ইচ্ছেগুলোকে নিয়ে তিনি চলে গেলেন ধরাছোঁয়ার বাইরে।

সমরেশ মজুমদার লিখেছিলেন–'মরণের কাছেই তো জীবনকে গচ্ছিত রেখে যায় এবং সেই অর্থে তো মরণের বিরাট বন্ধকি কারবার। যে জানে সে জানে মরণই পারে জীবনকে ফিরিয়ে দিতে। শুধু তার কাছ থেকে ফিরিয়ে নিয়ে আসাটা জানতে হয়"। এই ফিরে আসাটা তিনিই জানতেন, তাই তাঁর অস্তিত্বের অংশ হয়ে পাঠকের সঙ্গে রয়ে যাবে অনিমেষ মাধবীলতা, নবকুমার, অর্জুনেরা।

* 'বুকে হাত বোলাতেই ওর ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে যায় কেন? মায়ের কথা, এই শরীরটার কথা, সেই ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে যায় কেন? মায়ের কথা, এই শরীরটার কথা, সেই ছেলেবেলায় মায়ের তেল মাখানোর কথা! একটু একটু করে সেই যত্নে এই শরীরটার বড় হয়ে ওঠার কথা?

* 'মাঝে মাঝে শব্দ করে বাজ পড়ছে। মাথার পাশে কাচের জানালা দিয়ে বিদ্যুতের হঠাৎ জাগা আলোয় পাশের সবজিখেত সাদা হয়ে যাচ্ছে, সেই পলকের আলোয় বৃষ্টির ধারাগুলো কেমন অদ্ভুত দেখাচ্ছিল। সবজিখেতের মধ্যে বড় পেঁপেগাছটা হিড়িম্বা রাক্ষসীর মতো হাত পা নাড়ছে হাওয়ার ঝাপটে। ভয়ে চোখ বন্ধ করে ফেলল অনি। তারপর কখন কেমন করে জলের শব্দ শুনতে শুনতে ও ঘুমিয়ে পড়েছিল বুঝতে পারেন।' (উত্তরাধিকার)

* শেষ বিকালটা অন্ধকারে ভরে আসছিল। দুপুরের পর থেকে আকাশ মেঘলা, মাঝে মাঝে তরল মেঘেরা উড়ে উড়ে যাচ্ছিল আকাশছোঁয়া বাড়িগুলোর মাথা মুড়িয়ে। ...মেঘেদের চেহারা কি পৃথিবীর সব জায়গার একই থাকে? তা হলে স্বর্গছেড়া এমনকি জলপাইগুড়ির মেঘগুলোর চেহারা চালচলন এখানকার থেকে একদম আলাদা কেন? ভীষণ ময়লা আর ঠুনকো মনে হচ্ছে এদের। যেন খুব কষ্ট করে আসছে ওরা, জমতে হয় তাই জমছে।' (কালবেলা)

* 'একসময় সূর্যটা খুটিমারির জঙ্গলের ওপাশে মুখ ডোবালে স্বর্গছেড়া ছায়া-ছায়া হয়ে গেল। একরাশ পাখির চিৎকার আর মদেসিয়া কুলিকামিনদের ভাঙা ভাঙা গান জানান দিচ্ছিল রাত আসছে। ... হঠাৎ এই নির্জন পরিবেশে বিশাল সবুজের অঙ্গীভূত ঢেউ-এ দাঁড়িয়ে সূর্যাস্ত দেখতে দেখতে অনির মনে হতে লাগল ও খুব একা, ভীষণ একা। ... এই নির্জন সন্ধ্যানামা সময়টায় চা-বাগানের ভিতর দিয়ে দৌড়তে দৌড়তে গলা কাঁপিয়ে গাইতে লাগল, 'ধন-ধান্য-পুষ্প-ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা'।' (উত্তরাধিকার)

এই বিষণ্ন পঁচিশে বৈশাখ, সেই সুর আকাশে বাতাসে ভাসছে, সুরলোক থেকে গাইছেন সাহিত্যিক সমরেশ। •

গৌতম গুহ রায় ॥ কবি ও প্রাবন্ধিক

ধারাবাহিক উপন্যাস

বকেয়া হিসেব

শ্রীপর্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়

বকেয়া হিসেব

অজানা নম্বর থেকে বারংবার আসা ফোন তছনছ করে দেয় একটি মধ্যবিত্ত গৃহস্থালি। অভিনয় ও মডেলিংয়ের আগ্রহ ওঠে কাঠগড়ায়। চলে দুই বিবাহিত নারী-পুরুষের মধ্যে চাপান উতোর তাদের কন্যার ভবিষ্যৎ গড়া নিয়েও। এক সুন্দরী বিদুষী নারীর স্বপ্ন পূরণের তাগিদে বিপদ আমন্ত্রণ, না এক ইন্টেলিজেন্স আধিকারিকের পেশা ও পরিবারের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার জটিলতা, নাকি এক নিষ্পাপ শিশুর মা-বাবার কৃতকর্মের ফল ভোগ? কিন্তু কে বকেয়া হিসেবের খাতা খুলে বসে আছে? ব্যাস্, এটুকুই সুতো ছাড়া রইল। বাকিটা নিজেরাই আবিষ্কার করুন পাঠক–কীভাবে কল্পিত খলনায়ক ও কাল্পনিক গোয়েন্দা আর অহেতুক রহস্যের অযৌক্তিক জাল ব্যতিরেকে একেবারে বাস্তব সমাজ রাজনীতি কূটনীতি থেকে তুলে আনা বিষয়, আইবি, সন্ত্রাসবাদ, ফিল্মজগতের সঙ্গে সঙ্গে মানবিক সম্পর্কের রসায়ন পরতে পরতে ঘনীভূত হয়েছে। লেখিকা মনে করেন, বাস্তব হলো কল্পনার চেয়েও রহস্যময়। 'বকেয়া হিসেব' সেই রহস্যাবৃত বাস্তবকে আশ্রয় করেই।

তোমার দাদা পুরো দোতলাটা কব্জা করে রেখেছে। তাদের প্রসূন তো ভিআইপি। তোমার বোনের ছেলেমেয়ে, তাদের ভবিষ্যৎ সন্তান-সন্ততির জন্যও ব্যবস্থা আছে। শুধু আমরা বাদ। তাও আবার এই উত্তরমুখো, লিফ্‌ট ছাড়া ছোট ফ্ল্যাট নিয়েও ওদের কথা শুনতে হয়...'

'অনেক রাত হয়ে গেছে। আমার আর খিদে নেই। তুমি খেয়ে খাবার তুলে দিয়ো।'

'কেন খাবার কী দোষ করল?'

'তোমার কথায় পেট ভরে গেছে। আরও একটু খোঁজ করা উচিত ছিল তোমার বাবার আমার সাথে বিয়ে দেওয়ার আগে। এমন ঠগ পরিবার।'

'আমি কি ঠগ বলেছি? আর এই অবস্থার জন্য তুমিও দায়ী। টাকা ঢেলে গেছ, কিন্তু নিজের ঘরখানাও দাবি করোনি। আমার শ্বশুরবাড়িতে আমার অধিকার তোমার বৌদি বা আদরের রাজুর বৌয়ের চেয়ে কি কম? তাহলে আমাকে গিয়ে কেন অন্যের ঘরে শুতে হবে? আজ ওরা দুভাই আলাদা হয়ে গেছে। যে যার মতো ঘর বাড়িয়ে, রান্নাঘর করে, বাথরুম সাজিয়ে চলেছে

আমি ওখানে থেকে একটা ঘরে সামান্য কাজ করাতে চাইলে কেন বলা হবে, ভাড়াটে আছে, জায়গা হবে না। জায়গা হচ্ছে না যখন, ভাড়ার টাকাটাও তো আমদেরই প্রাপ্য হয়। ও কথা তো বলাই চলবে না, না তাদের কাছে, না তোমার কাছে।'

'খুব তো আশ্রমপাড়ায় থাকার কথা বলছ। তোমার লেখা, অভিনয়, মেয়ের মডেলিং এগুলো বজায় থাকত? হিয়া হওয়ার পর থেকে আমি রাজুর খরচ টানা এমনকি মাকে নিয়মিত টাকা পাঠানোও বন্ধ করে দিয়েছি। আর কী চাও? এর ওপর আমি বাড়ি ভাড়ার কথা তুলব? আমরা না থাকায় বাড়ির একটা রোজগার হচ্ছে সেটা ভালো নয়? ওখানে ইলেকট্রিকের বিল, পাম্পের বিল এসব এসটাবলিশমেন্ট খরচ বাড়ির ছেলে হিসাবে আমার দেওয়াটা কর্তব্য নয়? কিছুই তো দিই না।'

'দাও না? ওনারা ওখানে থাকলে দুই ছেলের সংসারেই রীতিমতো খরচ করেন। কিন্তু আমাদের কাছে থাকলে নিজেদের প্রতিদিনের ওষুধপত্র কেনা ছাড়া ডাক্তার দেখানো, টেস্ট করানো, এর বাড়ি ওর বাড়ি বেড়াতে নিয়ে যাওয়া সবই তো তুমি কর। বাড়তি সংসার খরচ তো ছেড়েই দিলাম। খাওয়া হোক না হোক রোজ এই এত এত রকম রান্না। সেই দিয়েও যদি মন পেতাম। তোমার বাবা আমার দেওয়া জলখাবারের থালা ছুড়ে ফেলেছিলেন একবার। মায়ের কথা না হয় বাদই দিলাম। আমার এমনকি নিজের মেয়ের প্রয়োজনেও ছুটি পাও না, এমনই নাকি তোমার চাকরি; কিন্তু মা-বাবা এলে আমাকে ভরসা করতে পারো না, পাছে তাদের দু টাকা খরচ হয়ে যায়, ভাইপো ভাইজি ভাগ্নে ভাগ্নির ভাগের টাকা কমে যায়, তাই নিজে কলকাতায় ছুটি নিয়ে ছুটে আসো। আমরা কোথাও বেড়াতে যেতে পারি না। সেই শিলিগুড়ি কিংবা ওনারা এলে তোমার কাকার বাড়ি মাসির বাড়ি এই তো ঘুরে মরতে হয় গাড়ি ভাড়া গুনে। আর এটা খুব হাস্যকর কথা নয়? যারা ইলেকট্রিসিটি কনজিউম করবে তাদের বদলে তুমি বিল মেটাবে। তোমার ভাড়াবাড়ির বা ফ্ল্যাটের পাম্প ইলেকট্রিকের খরচ কে দিত বা এখন দেয়? তোমার বাবা পেনশন পান। ওনার অবর্তমানে মা পাবেন। বাড়ির এসটাবলিশমেন্ট খরচ কী বলছ, বাড়ির তো রোজগার রয়েছে। সেখানে এত বছর ধরে নিজেকে নিঃস্ব করার পর নিজের সন্তানের মুখের দিকে তাকানোও কি অপরাধ?'

'কাল মেয়েটার স্কুল আছে। তোমার এসব কথা আগেও শুনেছি। আমারই ভুল। একে তো রাজেশ মিঠুদার কথা রেখে বিয়ে করা, তারপর কলকাতায় এসে থাকা। অন্য কোথাও ট্রান্সফারের জন্য অ্যাপ্লাই করা উচিত ছিল।'

'তাই তো, দুটো বছর বৌ মেয়ের সঙ্গে কাটিয়ে খুব অন্যায় হয়ে গেছে। তা বাড়িতে থাকতে চাইলে তোমার জায়গা হতো তো? তোমার একার হয়তো হতো, কিন্তু আমাদের হওয়ার দরকার নেই, তাই না?' সংযুক্তার গলা এবার বুঁজে এল।

এই লোকটা বিয়ের বারো বছর পরেও বৌকে নিজের জীবনের অঙ্গ বলে মেনে নিতে পারেনি। শুনেছে পুরুষ মানুষকে জব্দ করার শ্রেষ্ঠ উপায়, তার শরীরের খিদে না মেটানো। যদি একান্ত পাষণ্ড ধর্ষকের মতো বল প্রয়োগ না করে, তো ঐ দেহের চাহিদায় বৌয়ের বশ হয়। কিন্তু আভাসের বেলা ঠিক সেটাও খাটে না। কোনোকিছুই যেন ওর কাছে অপরিহার্য নয়। যখন ঘনিষ্ঠ হয়, তখন ভরিয়ে দেয়। কিন্তু সেটা হওয়ার তাগিদটাই কম। দূরে থাকলেও অন্য কোনো মেয়ের সাহচর্য পায় বা আজেবাজে জায়গায় যায়, সে কথা স্বয়ং ভগবান এসে বললেও সংযুক্তা বিশ্বাস করবে না। এই মানুষটার নিজেকে বঞ্চিত করেই সুখ, নিজের লোকসানেই নীতিবোধের তুষ্টি। যে কোনোভাবে নিজে লাভবান হতে না পারলেই ভাবে ন্যায় হলো। হয়তো সেই স্বভাবটার জন্যই বিশেষ মুহূর্তে নিজের সুখ লাভের আগে স্ত্রীর তৃপ্তি এনে দিতে বেশি যত্নশীল। কিন্তু কার সঙ্গে আছে সংযুক্তা? ওর কাছে বৌ আর তার মেয়ে নিছক একটা দায়িত্ব যা ব্যাংকের এটিএম কার্ড দিয়ে পূরণ করা যায়। দুটো বছর সংযুক্তা আভাসের সঙ্গে থাকতে এতটা অভ্যস্ত হয়ে গেছে যে, আবার চলে যাবে ভাবলে বুক খালি হয়ে যাচ্ছে। আর আভাসের অনুতাপ হচ্ছে বৌ আর মেয়েকে সুন্দর দুটো বছর দিয়ে ফেলার জন্য?

রাতের খাওয়ার পাট চুকতে চুকতে আজও দেরি হলো। আভাস বালিশে মাথা রাখামাত্র নাক ডাকায়। সংযুক্তা আর একবার গা ধুয়ে এসে তোয়ালে জড়ানো আধভিজে গা পাখার হাওয়ায় শুকোনোর জন্য ড্রেসিং টেবিলের স্টুলে বসল। ঘরে আলো জ্বালেনি। পাশের ঘর থেকে পরপর তিনবার টেলিফোনটা দু-একবার ক্রিং ক্রিং করে থেমে গেল। ঐ বদমাশটাই হবে। সারারাত যদি জ্বালায়। ফোনটা ক্রেডল থেকে নামিয়ে রাখবে, না তারটা খুলে নেবে? ক্রেডল থেকে বেশিক্ষণ নামানো থাকলে যদি ফোনটা পটোল তোলে? তারটাই খুলে ফেলা সঙ্গত মনে হচ্ছে। নাইটি পরা হয়নি তখনো, তোয়ালে বুকে চেপেই পাশের ঘরে গিয়ে আলো জ্বালালো। ফোনটাকে নিঃশব্দ করার পর আলো নিভিয়ে পাখা চালিয়ে বসে রইল। আপন মনে। যদিও লোকটার বেশি কিছু করার সাধ্য আছে বলে মনে হচ্ছে না, তবু নিরন্তর বিরক্ত করায় একটু ভয় ভয়ও করছে। তার ওপর তার ও তার মেয়ের অভিভাবক সঙ্গে থাকবে না। যখন ছিল না, ছিল না। কিন্তু গত দুবছরে সংযুক্তা আভাসের ওপর অনেক ব্যাপারে নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। বর কাছে থাকায় ওর লেখালিখিরও একটু সুরাহা হচ্ছিল। হিয়াকে বাড়িতে রেখে ছুটির দিনগুলোতে বেরোনো যাচ্ছিল।

সংযুক্তার লেখা হেভি ওয়েট লেখকদের মতো প্রচার না পেলেও অনেকের চেয়ে ভালো। যারা গল্প বা অণুগল্পের পত্রিকা সম্পাদনা করে, তাদের নিজেদেরই গল্পের ছিরি-ছাঁদ নেই। তাদের চেয়ে সংযুক্তার লেখা গল্প অনেক বেশি গভীর ও মনোগ্রাহী, গদ্যের চলন অনেক নামজাদা লেখকের চেয়ে ভালো। কথাগুলো এমন কিছু সাহিত্যিকের যাঁদের সংযুক্তাকে প্রশংসা করায় কোনো স্বার্থ নেই। তাহলে কি উঠে পড়ে গল্প নিয়েই লেগে পড়বে? বাণিজ্যিক পত্রিকায় নতুন লিখিয়ে হিসেবে কবিতার বদলে গল্প দিলে হয়তো মনোনীত হতে পারে। কিন্তু কবিতার চেয়ে গল্প লেখা ঢের হ্যাপার ও কঠিন বলে মনে হয়। প্রবন্ধ ও গুটিকয় অণুগল্পের জন্য দু-একটি লিটিল ম্যাগাজিনে নড়বড়ে হলেও একটা জায়গা তৈরি হওয়ার মুখে। বাচ্চাদের জন্য লেখা পরপর দুটো গল্প ও একটা ছড়া একটা বাণিজ্যিক পত্রিকায় মনোনীত হওয়ার পর থেকে গল্পের প্রতি বেশি মনোনিবেশ করছে। কবিতা লিখে অনায়াসে নাম করার ভাগ্য নিয়ে সংযুক্তা জন্মায়নি। কিন্তু যারা পোস্টকার্ডের মতো প্রাগৈতিহাসিক মাধ্যমে লেখা মনোনীত বলে জানিয়েছে, প্রকাশের জন্য তাদের 'যথাসময়' দেড় বছর পরেও আসেনি। লিটিল ম্যাগাজিনই বল ভরসা। ধুস্! এইসব গোলমেলে লাইন থেকে সরে লেখালিখি নিয়েই ব্যস্ত থাকবে এবার থেকে।

কাঁধে হাত পড়তে চমকে অন্ধকারেই ফিরে তাকালো। আভাস বলল, 'ঘুমোতে যাবে না? এখানে বসে কী করছ?'

'ল্যান্ড লাইনটা ডিসকানেক্ট করে দিলাম।'

আভাস অন্ধকারে বৌয়ের গায়ের তোয়ালে সরিয়ে বলল, 'সোনা, রাগ করো না। টিন এজার মেয়ের বাবাকে যেমন উদ্বিগ্ন থাকতে হয়, আমায় এই আটত্রিশ বছরের বৌটাকে নিয়ে তেমন টেনশন করতে হচ্ছে। কবে তোমার ম্যাচিওরিটি আসবে?'

আধঘণ্টা পরে ঐ ঘর থেকে বেরিয়ে দুজন দুটো স্নানঘরে। বেরিয়ে এসে দুজন কন্যার দুপাশে শুয়ে পড়ল।

সন্ধান

টেলিফোন অফিসের লোক বোঝানোর চেষ্টা করেছিল, লাইনে গোলমাল নেই যখন অবাঞ্ছিত কল আটকানোর জন্য নম্বর বদলে নিলেই তো হয়, বিএসএনএল-এর ল্যান্ডলাইন আর ব্রডব্যান্ড লোকে আবেদন করেও পায় না, সেই লাইন কাটিয়ে ফেলা বোকামি। কিন্তু আভাস গোঁ ধরেছিল। সংযুক্তার কিছু বলতে সাহস হয়নি। ল্যান্ড লাইন আর ব্রডব্যান্ড কাটিয়ে দিয়ে বর্তমানে একটা সিম-এর সাহায্যে যাচ্ছেতাই গতির ইন্টারনেট দিয়ে কাজ চালাচ্ছে।

আভাস এক সপ্তাহের জন্য রাজস্থান গেছে। জয়পুর ছাড়া আরও দু-এক জায়গায় যেতে হবে। কিছুতেই খোলসা করে বলে না সবটা। এত গোপনীয়তার কী আছে কে জানে? ফিরে এসেই নাগাল্যান্ড চলে যাবে। ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোতে কাজ তো অনেকেই করে, সবারই কি ব্যক্তিগত জীবন সরকারের ভোগে চলে যায়? এর মধ্যে রিমি আবার একটা ডাক পেলো। গিয়ে দেখে অডিশন দিতে অনেকে এসেছে। প্রত্যেকের কাছে ভোটার কার্ড বা সচিত্র পরিচয়পত্রের প্রতিলিপি, পাসপোর্ট আকারের একটি করে ছবি, পোস্টকার্ড আকারের একটি শুধু মুখের ও একটি পূর্ণাবয়ব ছবি

আর অডিশন ফি বাবদ দুশো টাকা নেওয়া হচ্ছে। ও বাবা! টাকা দিয়ে অডিশন দিতে হবে জানলে কষ্ট করে আসতে বয়ে গিয়েছিল।

বিভিন্ন বয়সের নারী, পুরুষ, বাচ্চা। টাকা জমা নিচ্ছে একটি মধ্যত্রিশের মহিলা। সবাই ডলিদি বলে ডাকছে। মহিলার মুখখানা কী ভীষণ চেনা। ঐ মহিলার ভুরু সরু করে প্লাক করা। ঠোঁট বেশ পুরু। আর চোয়ালের ওপর মুখের দুপাশে আবছা লম্বাটে টানা দাগ, যেন আলাদা করে মাংস চাপিয়ে নাক মুখ তৈরি করা হয়েছে। সংযুক্তার ক্যামেরায় মন নেই, কেবল চোখ চলে যাচ্ছিল ঐ মহিলার দিকে। হঠাৎ ভেতরটা ছ্যাঁৎ করে উঠল, ঐরকম মুখ দেখেছে আয়নায়। সংযুক্তার মুখে খানিক কাটাছেঁড়া করলে যা দাঁড়ায়, ডলির মুখখানা যেন সেইরকম।

ক্যামেরায় একটি বেকহ্যামের মতো মোরগ ঝুঁটি করা ছোকরা। ঠোঁটের নিচে 'দিল চাহতা হেয়'-এর আমির খান মার্কা ছোট্ট দাড়ির ত্রিকোণ ছাড়া পরিষ্কার করে দাড়িগোঁফ কামানো। যে যার পরিচয় দিয়ে ইচ্ছামতো সংলাপ বলে অভিনয় করে দেখাচ্ছে। মাঝবয়সী একটা লোক 'ওকে' বলার আগে একেকজনকে একেকরকমভাবে উপদেশ মায় খিঁচুনি দিয়ে যাচ্ছে।

ডলি নামের মহিলাটির ফোন এল। বেশ কয়েকবার কেটে দিলো। বলল, 'ব্যস্ত আছি।' তারপর একবার ফোন ধরে একেবারে আড়ালে গিয়ে চাপা গলায় কথা শুরু করল। ও সংযুক্তাকে দেখেনি।

'বললাম তো। তোমার বখরা তুমি পেয়ে যাবে। খামোখা দিমাগ গরম করছ কেন? আমাকে সবদিক সামলে চলতে হয় তো নাকি? ঐ চারটে মেয়েকে তো রোমিলা দুবাই পাঠিয়েছে। দিলারা নিজে আমায় জানিয়েছে। আর ছেলেগুলোর খবর আসলাম জানে। তোমার মালের খদ্দের যে, তাকে খোঁজ। আমার কাজ হিউম্যান রিসোর্স সাপ্লাই করা।'

ও পক্ষ কিছু বলল। শোনার জন্য ডলি চুপ করেছিল।

'রমেশ, শোনো অডিশন দিতে অনেকে এসেছে। বম্বের একটা ফিচারের জন্য ক্রাউড আর জুনিয়ার আর্টিস্ট চাই। তোমার টাকা তুমি পেয়ে যাবে। পরে কথা বলছি।' রমেশ, রোমিলা, আসলাম ইত্যাদি কয়েকটা নাম ছাড়া বিশেষ কিছু বোঝা গেল না, তবে মহিলার কাজকারবার যে সুবিধার নয়, সেটা অনুমান করা যায়।

ওপাশ থেকে আর কোনো কথা শোনার আগেই ডলি নিজের লাইন কেটে দিলো। ফিরে আসতে যাচ্ছিল। আবার ফোন। বিরক্ত হয়ে ধরল। 'বলেছি না আমাকে নূপুর বলে ডাকবে না! আমি ডলি।'

সংযুক্তার ক্যামেরায় মন নেই। ডলিকে দেখা ইস্তক সেদিকেই চোখ আর কান আটকে আছে। ঐ পক্ষের কথা শোনেনি। কিন্তু 'নূপুর' নামটা মাস দুয়েক ধরে ওকে তাড়া করছে। ডলিকেও কেউ ফোনে নূপুর বলে ডাকছে! আর যখন তখন ফোন করা লোকটা নিজেকে রমেশ প্রধান বলেই পরিচয় দিত। এতগুলো কি কাকতালীয় হতে পারে?

এতদিন পুলিসে অভিযোগ জানিয়ে কোনো লাভ হয়নি। মাঝখান থেকে একজন পুলিসকর্মী আবার ভুলভাল নম্বরে ডায়াল করে একজন গোবেচারা শিক্ষককে ক্লাসের মাঝখানে শাসানি দেয়, 'সংযুক্তা আচাজ্জিকে চেনো? ... চেনো না যখন ফোনে ডিসটার্ব করো কেন?... কী করো?... টিচার?... ঠিক আছে লেখাপড়া নিয়েই থাকো, ফের ফোন করলে ভেতরে ঢুকিয়ে দেবো।...নাম কী?... রমেশ প্রধান নয়? তাহলে কে? কোথায় থাকো?...আচ্ছা আচ্ছা...' থানার মেজোবাবু তাকে ধমকে ডায়রি না নেওয়ালে চিত্রনাট্য কোথায় শেষ হতো কে জানে? হায় ভগবান। ঐ বেচারা শিক্ষক কী ভাবল? সংযুক্তা আচার্য্য নামে এক সাংঘাতিক মহিলা তার নামে মিছিমিছি থানায় নালিশ করেছে। বেচারা আরও কতদিন ভয়ে ভয়ে ছিল কে জানে, নাকি এখনো আছে?

কিন্তু ভয় যে দেখাত তার সঙ্গেই কি কথা বলছে ডলি ওরফে নূপুর? মুখের মিলের কারণেই কি রমেশ সংযুক্তাকে ফোন করছে? কিন্তু রমেশ যদি আসল নূপুরের হদিশ জানেই, তাহলে সংযুক্তাকে নূপুর বলে দাবি করছে কেন? নাকি সবে খবর পেয়ে নূপুরকে পাকড়াও করেছে, সংযুক্তাকে আর জ্বালাতন করবে না? মাথাটা টলে গেলেও প্রচণ্ড কৌতূহল হচ্ছে।

হিয়া আর একটি বাচ্চা মেয়ের সঙ্গে স্টোন-পেপার-সিজার খেলছিল। সংযুক্তা বাচ্চাটার মাকে বলল, 'একটু দেখবেন আমার মেয়েকে? আমি একটু টয়লেট থেকে ঘুরে আসছি।'

হিয়াকে মহিলার কাছে বসিয়ে রেখে ডলির পিছু নিলো সন্তর্পণে। ছোট বাইরে যাওয়ার সত্যিই প্রয়োজন ছিল। ফেরার রাস্তাটা অনেকটাই লম্বা। ডলি দুর্গন্ধী প্রসাধনকক্ষের অন্য পাশে একটা অপ্রশস্ত কুঠুরিতে দাঁড়িয়ে ফোনে কথা বলছিল। পেছন ফিরে থাকায় সংযুক্তাকে লক্ষ করেনি। অপরিসর ছোট বাথরুম থেকেই শুনতে পেল ডলির কথা। 'তাতে কী? একজনের একের বেশি নাম থাকতেই পারে। নিকনেমও থাকে। আমারও দুটো নাম, নূপুর ভালো নাম, আর ডলি ডাকনাম। ইন্ডাস্ট্রিতে ডলি নামেই চেনে। হয়েছে? আর শোন, আসলামকে আমি ইন্ট্রোডিউস করিয়েছি মানেই তার সব দায়িত্ব আমার নয়। তোমরা তো দুজনে নিজেরাই ডাইরেক্ট অনেক কিছু নিগোশিয়েট করছ আমাকে না জানিয়ে। তা হলে এখন নূপুর নূপুর করে আমায় জ্বালাতন করছ কেন? তোমার মালের টাকা তুমি আসলামের কাছ থেকে আদায় করো। আমি আমারটা সময়মতো দিয়ে দেবো।'

এতদিন ফোনের অবাঙালি লোকটাকে সাংঘাতিক মনে হতো। এখন মনে হলো চোরের ওপর বাটপারি করার মতো সাংঘাতিক মানুষের ডেরায় এসে পড়েছে। কাঁপা হাতে ছিটকিনি খুলে বাথরুম থেকে বেরিয়ে দিগ্‌বিদিগ্‌ জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটল জটলার দিকে। ঐ ভদ্রমহিলাকে খুঁজে পেল না। হিয়া কোথায়? হে ঈশ্বর! ঐ মহিলাও তো মেয়ের অডিশনের জন্য এসেছিলেন। অতি পাঁচপেঁচি। তার জিম্মায় মেয়ে রেখে গোয়েন্দাগিরি করতে গিয়ে..? প্রকৃতির ডাক আরও কিছুক্ষণ চেপেও রাখা যেত। হিয়া কৈ?

'হিয়া, হিয়া, সোনা মামাই। আচ্ছা অবন্তিকা নামের বছর ছয়েকের কোনো বাচ্চা মেয়েকে দেখেছেন?'

'ঐদিকে এখন বাচ্চাদেরটাই হচ্ছে। দেখুন গিয়ে।'

জটলা ঠেলেঠুলে ফাঁক থেকে দেখতে পেল, হিয়া নিজের নাম লেখা একটা প্লেট ধরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে। ঐ ভদ্রমহিলার মেয়ে ক্যামেরার সামনে। সংযুক্তা ভিড় ঠেলে সামনে এগোতে গিয়ে হোঁচট আর দাঁত খিঁচুনি দুটোই খেলো। সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করার সময় নেই। ঝাঁপিয়ে পড়ে মেয়ের হাত ধরে টান মেরে বলল, 'বাবু চল। এক্ষুনি বেরোতে হবে।'

'কিন্তু আমার অডিশন হয়নি। আমি যাব না।'

'এটা করতে হবে না। বাজে কাজ। আমরা এখনই বেরিয়ে যাব।'

হিয়া পা দাপিয়ে কাঁদতে লাগল। 'আমি তো আসতে চাইনি। তুমিই জোর করে নিয়ে এলে। আর এতক্ষণ ওয়েট করার পর যখন আমার টার্ন এল তখন করতে দিচ্ছ না। এটা আমি পারব মা।' •

চলবে...

শ্রীপর্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীপর্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম ৫ ডিসেম্বর, ১৯৭১ মেদিনীপুর। পৈতৃক বসবাসসূত্রে শেকড় পশ্চিম বর্ধমানের আসানসোল মহকুমার ডিশেরগড় খনি অঞ্চলে। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএসসি (রসায়ন), বিএড, এমবিএ'র পর কর্মজীবন শুরু করেন ফার্মাসিউটিকল কোম্পানির ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি হিসেবে। বর্তমানে একাধিক বাণিজ্যিক-অবাণিজ্যিক পত্রপত্রিকায় গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, ছোটদের গল্প, ছড়া, ফিচার, বই বা নাটক পর্যালোচনা ইত্যাদি রচনায় নিয়োজিত। পেশাদারিভাবে ইংরেজি কনটেন্টও লিখেছেন অসংখ্য। কবিতা দিয়ে যাত্রা শুরু হলেও শ্রীপর্ণার গদ্যসৃষ্টি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব, ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণামূলক প্রবন্ধ ও ফিচারগুলো তাঁর মননের অন্যতম পরিচয়। গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ ও অনুবাদের জন্য পেয়েছেন বঙ্গ সংস্কৃতি পুরস্কার, ঋতবাক পুরস্কার, শর্মিলা ঘোষ স্মৃতি পুরস্কার, ঊষা ভট্টাচার্য স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার, নবপ্রভাত রজত জয়ন্তী বর্ষ স্মারক সম্মান, প্রতিলিপি বিশেষ পুরস্কার, রাজেশ সরকার স্মৃতি পুরস্কার, পদাতিক কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় স্মৃতি পুরস্কার (মেঘদূত সাহিত্য পত্রিকা–সেরার সেরা সম্মান), ডলি মিদ্যা স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার, স্মৃতি ও চেতনা পুরস্কার, People Reflections Special Recognition, সোনালি ঘোষাল পুরস্কার (অনুবাদ) ইত্যাদির মতো নানা পুরস্কার।

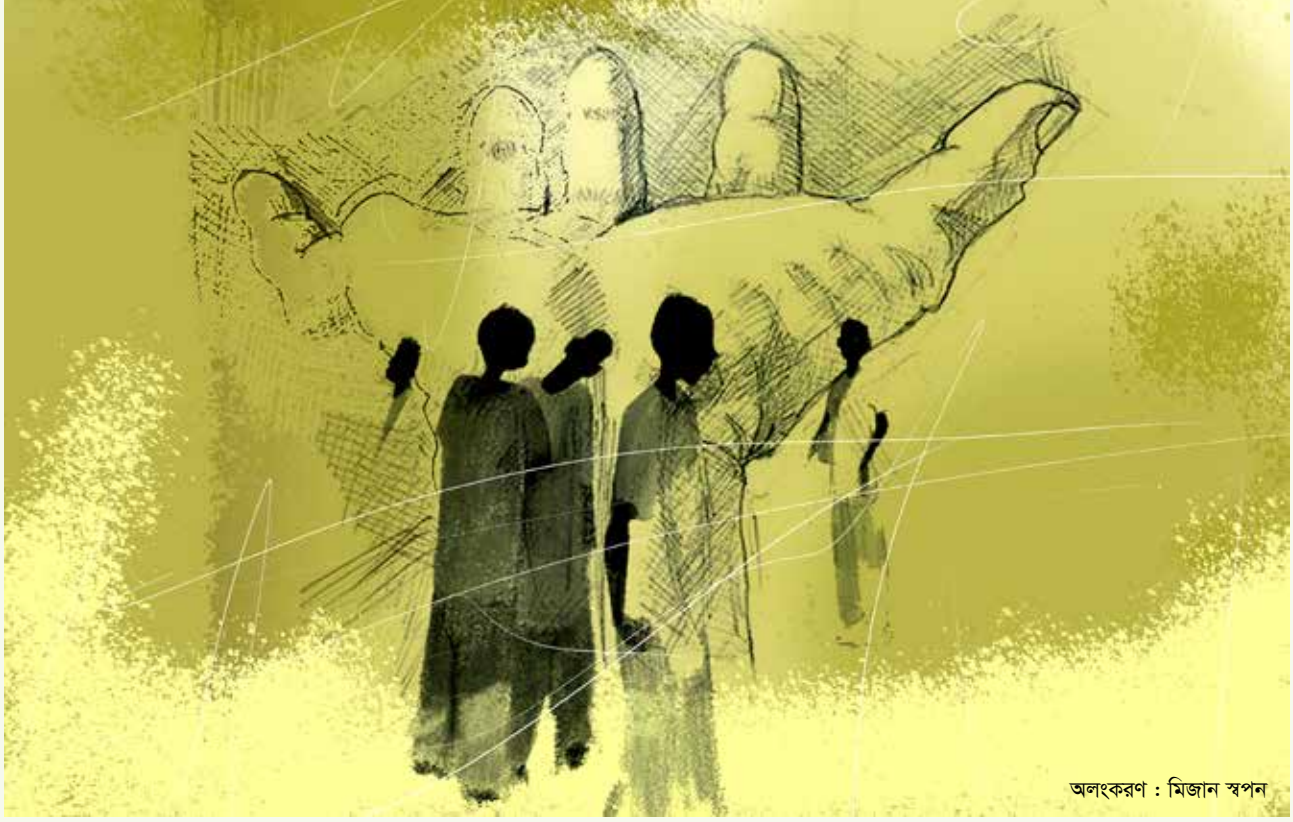

অলংকরণ : মিজান স্বপন

ছোটগল্প

ভিখিরি সমিতির সদস্যরা

সায়ন্তনী ভট্টাচার্য

–সোনার পালঙে শোবো মোরা, রুপোর জলে গা ধোবো/ এ জেবনে ভরাট জেবন পাব।

ভারী সুন্দর গান ধরেছেন কুচুমশাই। স্বরচিত গান। ফুলকুমার, নিন্নাবুড়ি, নুড়িবাবু, মিহিদাদা, কুমুলালের মন গান শুনে ফুরফুর করছে। ফুরফুরের মধ্যে খানিক কান্নাও আছে বটে। কান্না গলার কাছে ঢেউ তুলছে। এদিকে গঙ্গার জলে চাঁদের আলো পড়ে জল চিকচিক করছে। শহরের অন্য আলোগুলো চাঁদের আলোকে গিলে খাবে বলে তেড়েফুঁড়ে উঠতে চাইছে। কিন্তু চাঁদের আলো সব্বাইকে ছাপিয়ে গেছে। কুচুমশাই গাইছে, জেবনের রঙে রসে মন আনচান/ তোমার ওই চোখের জলে ডাকল বান...। কুচুমশাইয়ের দরাজ গলা গমগম করছে

নিন্নাবুড়ি ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলল। ফুলকুমার ফিসফিস করে বলল, কি হলো গো ঠাকুমা? কুচুমশাইয়ের গানে যাতে অসুবিধা না হয় তাই নিন্নাবুড়ি ফুলকুমারের থেকেও গলা নামিয়ে বলল, কেমন যেন দুঃখু দুঃখু পাচ্ছিরে ফুলকুমার। কুচুমশাই এমন সুন্দর জেবনের গান গাইছে আর আমরা সেই জেবন থেকেই ছুটি নেবে বলে কিনা মা গঙ্গার কাছে এসেছি!

ফুলকুমার বলে, তা কি করবে বলো ঠাকুমা, 'পথের ধার ভিখিরি সমিতি'র মিটিংয়ে তো তাই ঠিক হলো। ঠিক হলো আর বেঁচে থেকে লাভ নেই, আজই সবাই মিলে মাগঙ্গার কাছে জেবন দেবো।

ফুলকুমার আর নিন্নাবুড়ির কথা বোধহয় কানে গেছিল নুড়িবাবুর। আহা তার বড় নরম মন। আর থাকতে না পেরে নুড়িবাবু তাই কেঁদে উঠল। কান্না শুনে বিরক্ত হয়ে কুচুমশাই গান থামিয়ে দিলেন। মিহিদাদা নুড়িবাবুর পিঠে হাত বোলাতে বোলাতে বলল, আহা ষাট ষাট।

কুমুলাল বলল, ও নুড়িবাবু, কাঁদো কেন?

নুড়িবাবু ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলে, মরণের সময় ওরকম জেবন জেবন করে গাইতে আছে? আমার মরার ইচ্ছেটা কেমন ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ করে।

কুচুমশাই বললেন, তা বললে তো হবে না, একসঙ্গে মরব বলে ঠিক যখন করেছি, তখন মরবই। 'পথের ধার ভিখিরি সমিতি'র মিটিংয়ে তো তাই সিদ্ধান্ত হলো।

নিন্নাবুড়ি কুচুমশাইকে ভয় পায়। ভিখিরি সমিতির মোট এই ছয় জন সদস্য। কুচুমশাই তাদের মধ্যে বয়সে সবচেয়ে বড়। বয়েস নয় নয় করেও নব্বুই হবে। চোখে দেখতে পান না ঠিকই, কিন্তু এমনিতে শক্তপোক্ত আছেন। শোভাবাজার মেট্রোর বাইরে চট পেতে বসে ভিক্ষে করেন। সামনে থালা পাতা থাকে, কুচুমশাই নিজের মনে গান গাইতে থাকেন, থালায় টাকা পড়তে থাকে। মুখ ফুটে কারোকে বলেন না, দাও। কুচুমশাই সামনে এলেই নিন্নাবুড়ির বুকটা কেমন ধরাস ধরাস করে। নিন্নাবুড়িরও তো মেঘে মেঘে কম বেলা হলো না, এ বছর সত্তরে পড়েছে। যৌবন যখন ছিলো তখন ওই শোভাবাজার-চিৎপুর ঘেষে ওই পাড়ায় থাকত। আরে ওই পাড়া গো, ওই পাড়া। জীবনে উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল। ইচ্ছে ছিল বয়েস বাড়লে ঠেকের মাসী হবে। হাতে পাঁচ-দশটা ডবকা মেয়ে থাকবে। তাদের কামাইয়ে নিন্নাবুড়ির চলে যাবে। কিন্তু সে আর হলো কই? স্টোভ বার্স্ট করে নিন্নাবুড়ির সারা গা-মুখ পুড়ে গেল। কী যে জ্বালা আগুনে পোড়ার! তা তারপর আর ওই পাড়ায় ফিরতে পারেনি। গিরিশ পার্কের মোড়ের ভিখিরি হয়েছে। নিন্নাবুড়ি অদ্ভুত ঘ্যানঘ্যানে গলায় সারাদিন, এ বাবু, এ মাইয়া, এ দিদি রুপায়া দো বলে ভিক্ষে করে। নিন্নাবুড়ি খাঁটি বাঙালি, কিন্তু ভিক্ষে করতে গেলেই মুখ থেকে হিন্দি বেরোয় কেন কে জানে! কুচুমশাইয়ের কথার জবাবে আজ নিন্নাবুড়ি সাহস করে বলেই ফেলল, তা কুচুমশাই মরতে আমারো ইচ্ছে করে না।

কুচুমশাইয়ের ভুরু কুঁচকে গেল। নিন্নাবুড়ি থেমে থেমে বলল, আজ

আমার কামাই হয়েছে প্রায় একশো টাকা। বেঁচে থাকলে কাল বিরিয়ানি খাব। কিন্তু মরে গেলে যে আর বিরিয়ানি খাওয়া হবে না। আর এই একশো টাকাই-বা কাকে দিয়ে যাব? আমি তো মা গঙ্গায় ডুবে মরব, কিন্তু এই একশো টাকা তো মরবে না। খাটনির টাকা তো আর জলে দিতে পারি না।

কুচুমশাই গলা খাঁকড়ে বললেন, আর কে কে মরতে চাও না বলো।

ফুলকুমার বলল, কুচুমশাই, মরতে আমিও চাই না। আমি জানি, আপনি বলবেন আমার বেঁচে থাকার তো কোনো কারণই নেই। আমার দুহাত নেই, দুপা নেই, বেঁচে থাকার কারণও নেই। তবু আমি বাঁচতে চাই কেন? তা এর উত্তর আমার কাছে নেই কুচুমশাই। আমি তো চাকা লাগানো পিঁড়িতে বসে ভিক্ষে করি। শ্যামবাজার থেকে জানবাজার সব জায়গায় ঘুরি। দেখি মানুষের আর শেষ নেই। পিলপিল করছে মানুষ। ভিক্ষেও দেয় এরা। এই তো কাল আমার রোজগার হয়েছে দেড়শো টাকা। জমানোর কৌটোয় পঞ্চাশ ফেলেছি, তিরিশে ভাত-ডাল সাপটেছি আর বাকি সত্তরে চাঁদনি থেকে সানগ্লাস কিনেছি। তা সে সানগ্লাস যখন চোখে দিয়েছি নিন্নাবুড়ি বলে কি আমাকে নাকি সলমল সলমন লাগে। আমার বয়েস হবে এই পঁচিশ-তিরিশ, এ বয়সেই মরে যাব?

ঠিক এই সময় কুমুলাল কেশে উঠল। ফুলকুমার কুমুলালের কাশির অর্থ বুঝতে পেরে বলল, আহা ঠিকাছে ঠিকাছে, বয়েস নাহয় একটু কমিয়ে বলেছি, তা বলে পঁয়তিরিশ-চল্লিশের বেশি হবে না।

কুমুলাল আবার কাশল। ফুলকুমার বলল, আচ্ছা বাবা পঞ্চাশ। পঞ্চাশের একদিনও বেশি নয় আমার বয়েস। তা এই বয়সে মরে যাব?

নুড়িবাবু কুচুমশাইয়ের থেকে সাত-আট বছরের ছোট হবে। বলল, আমার আজকাল রোজগারপাতি খুব কম হচ্ছে।

মিহিদাদা মুখ ঝামটা দিয়ে বলল, সে তো বুড়ো তোমার স্বভাবের জন্য। ভিড়ের মধ্যে মেয়েদের গায়ে হাত দাও কেন! বুড়ো হয়েছ, তাও নোলা গেল না।

নুড়িবাবু রেগে যায়। বলে, বেশ করেছি মেয়েদের গায়ে হাত দিয়েছি। কার বাপের কি? আরে ভাই আমি কি তোদের মতো জন্ম ভিখিরি? ছেলে হাওড়া স্টেশনে বসিয়ে রেখে পগাড় পাড়। ভাড়াবাড়িতে ফিরেও গেছিলাম, দেখি বাড়িওয়ালা নতুন ভাড়াটে বসিয়েছে। সে বলল ছেলের ঠিকানা জানে না। আমি বুঝলাম, ছেলে বাপকে তার সংসারে চায় না। সেই থেকে ভিক্ষে করি। তা মাঝে মাঝে মনে হয় ওই বুঝি আমার ছেলের বৌ, ওই বুঝি আমার নাতনি, ওমনি হাত চেপে ধরি। আর তোরা বলিস কিনা আমার স্বভাবের দোষ!

নুড়িবাবু হাঁফাচ্ছে। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। নিন্নাবুড়ির সঙ্গে একটা স্টিলের গ্লাস ছিল। তাতে করে মাগঙ্গার জল নিয়ে এসে নুড়িবাবুর মাথায় দেয়, শান্ত করতে চেষ্টা করে। নুড়িবাবু হাঁফাতে হাঁফাতে বলে, তবু আমি মরতে চাই না। মরলে যে আর কোনোদিন ছেলে, বৌমা, নাতনিকে দেখা হবে না।

মিহিদাদা নুড়িবাবুকে রাগিয়ে দিয়ে বেশ লজ্জিত হয়ে আছে। তবু সাহস করে বলে ফেলে, নাহ, আমিও মরতে চাই না। মানছি আমার হাত-পা সব ব্যাঁকা, অনাথ মানুষ, মরলেই আপদ চুকে যায়। কিন্তু তারপর ভাবি মরেই যদি যাব তো এতদিন কষ্ট করে বাঁচলাম কেন? আমি তো জন্ম থেকেই এমন। তা একটু বড় হতে যখন বুঝলাম আমি কোনোদিন ঠিক হব না, তখন মরলাম না কেন? আজ মরলে এতদিন কষ্ট করে বেঁচে থাকাটা মাটি হয়ে যাবে।

তিন ফুট আট ইঞ্চির কুমুলালও বাঁচতে চাওয়ার ইচ্ছের কথা বলেই ফেলল। তার স্থির বিশ্বাস বেশিদিন তাকে ভিক্ষা করে খেতে হবে না, খুব তাড়াতাড়ি সে সার্কাসে একটা কাজ পাবেই পাবে।

সবার কথা শুনে কুচুমশাইয়ের মন কেমন কেমন করে উঠল। মনের চোখ দিয়ে তিনি দেখলেন এই গভীর রাতে, গঙ্গার ধারে পরিরা নেমে এসেছে। পরিরা ভিখিরিদের চোখে ঘোর তৈরি করে দিচ্ছে, তারা বাঁচতে চাইছে। চাঁদের আলোও হয়েছে আরেক শয়তান। সে তার মায়া ছড়িয়ে দুনিয়ার রূপ মেলে ধরছে। হাওড়া ব্রিজের আলো গুনগুন করে জ্বলছে, এপার-ওপার নিস্তব্ধ হয়ে আছে আর তার মাঝে 'পথের ধার ভিখিরি সমিতি'র ছ জন সদস্যের মন বদলে যাচ্ছে। কিন্তু কুচুমশাই জানেন কাল সূর্য উঠলেই জীবন কত খ্যানখ্যানে হয়ে উঠবে। জীবন তাদের দুয়ো দেবে, মাথা নুইয়ে দেবে, ঘাড় ধরে ঝুঁকিয়ে শহরের রাস্তায় হেঁটে চলা লাখ লাখ রকমারি জুতোর ধুলো চাঁতে বাধ্য করবে। কাল আবার সবার মনে হবে বেঁচে কি লাভ! কুচোমশাই একটু কঠিন স্বরেই বললেন, কাল কিন্তু আমরা ভিখিরিরা মিলে ঠিক করেছিলাম সবাই একসঙ্গে মরব, আজই মরব। কি, করিনি?

কেউ কোনো উত্তর দিলো না।

কুচুমশাই বললেন, দ্যাখো তোমরা দুর্বল হয়ো না। বেঁচে থেকে আমাদের কোনো লাভ নেই। আমাদের অবস্থা কিছুমাত্র বদলাবে না, ফলে আমাদের মরাই ভালো। চলো আমরা একসঙ্গে এই ঘাটের সিঁড়ি দিয়ে নেমে গিয়ে মাগঙ্গার জলে ঝাঁপ দেই। আমাদের জ্বালা জুড়োক।

মিহিদাদা ফিসফিস করে বলল, কি করে জানলেন?

কুচুমশাই অবাক হয়েই বললেন, কোনটা কি করে জানলাম?

–এই যে আমাদের জীবন আর বদলাবে না? না, হয়তো ভালো কিছু হবে না, ধরেই নিলাম ভালো কিছু হবে না। কিন্তু খারাপ কিছু তো হতেই পারে। খারাপ কিছু হওয়াটাও তো বদল। সেটা দেখার জন্যও কি বাঁচা যায় না?

–তোমরা ভুল করছ। এই অবস্থা থেকে আরো খারাপ অবস্থায় যাওয়ার কোনো মানে হয় না, মরাই ভালো।

এদিকে রাত পড়ে এসেছে। দু-একজন প্রাতঃভ্রমণকারী 'পথের ধার ভিখিরি সমিতি'র গোল জমায়েতের পাশ দিয়ে হেঁটে যায়। নিন্নাবুড়ি বলে, ভোর হব হব করছে। এসময় মরাটা খুব কঠিন। কেউ না কেউ ঠিক বাঁচিয়ে দেবে। একবার বাঁচিয়ে দিলে তখন আর যমও নিতে আসবে না। আমি বলিকি আজ সারা দিন ভিক্ষা করি। ভিক্ষা করতে করতে মন শক্ত করি। রাত হোক, রাতে আমরা ঠিক মরব। কথা যখন দিয়েছি কুচুমশাই মরব তো বটেই।

নিন্নাবুড়ির প্রস্তাব পাঁচ-এক ভোটে পাস হয়ে যায়। কুচুমশাই দীর্ঘশ্বাস ফেলেন।

২.

কুচুমশাই স্বরচিত গান ধরেছেন, জীবন আমার আলোয় আঁধার/ না দেখা যায় এপার-ওপার। 'পথের ধার ভিখিরি সমিতি'র সবাই এ'রাতেও জড়ো হয়ে গান শুনছে। গান শেষ হলেই সবার একসঙ্গে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে মরার কথা। কিন্তু চাঁদের আলো, শহরের মধ্যরাতের নির্জনতা আর জীবনের পরিরা একে একে নেমে এসে মরার ইচ্ছেকে আজও বদলে দিতে থাকে। কথায় কথায় ভোর হয়ে যায়। নিন্নাবুড়ির প্রস্তাব আজও পাঁচ-এক ভোটে পাস হয়ে যায়। মরা আর হয়ে ওঠে না। কুচুমশাই দীর্ঘশ্বাস ফেলে তার জন্মান্ধ চোখকে দুয়ো দিয়ে বলেন, এসব ওই চাঁদের শয়তানি খেলা। আহা কেমন সে চাঁদের আলো, যে মরাকে বাঁচায় বদলে দেয়? আমার আর সে আলো দেখা হলো না। ঠিকাছে, সামনে তো অমাবস্যা, দেখি তখন আমাদের মরা আটকায় কোন শালা চাঁদ!

৩.

অমাবস্যার রাত। 'পথের ধার ভিখিরি সমিতি'র সদস্যরা গঙ্গার ধারে বসে আছে। জীবন একই ভাবে চলছে। ভালো-খারাপ কোনো বদল নেই। কুচুমশাই গান গাইছেন, ও আমার জীবনপুরের রাত/ ও আমার দুঃখদিনের ভোর/ ও আমার ছলাৎ ছলাৎ এগিয়ে চলা নদী/ মনের মানুষ মিলতো যদি...। আজ আর চাঁদের আলো নেই। আজ কে বাঁচায় তবে! আজ গানের পরে গান গাইতে থাকে কুচুমশাই, মরার কথা বলে না। বুকভরে গান গায়। তারা খসছে দু-একটা। খসে যাওয়া তারার জন্য কিছু নক্ষত্র কাঁদছে। একটু আলো দেখা যাচ্ছে, ভোর হয়ে এলো। নিন্নাবুড়ি বলে ওঠে, ওই যা, ভোর হয়ে গেল যে। ও কুচুমশাই, আজও তো মরা হলো না।

নব্বুইয়ের কুচুমশাইয়ের এই অমাবস্যার চাঁদের রাতে, গঙ্গার সামনে দাঁড়িয়ে মনে হয় আরো দু-একশো বছর হেসেখেলে বেঁচে থাকা জরুরি। চাঁদের আলো থাক বা না থাক, বেঁচে থাকাটাই জরুরি। •

সায়ন্তনী ভট্টাচার্য ॥ গল্পকার

PUNJAB MAP

একনজরে পাঞ্জাব

দেশ	ভারত
অঞ্চল	ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল
রাজধানী	চণ্ডীগড়
জেলা	২৩টি
প্রতিষ্ঠা	১ নভেম্বর ১৯৫৬
সরকার	
• গভর্নর	বনোয়ারিলাল পুরোহিত
• মুখ্যমন্ত্রী	ভগবন্ত মান
• আইনসভা	এককক্ষবিশিষ্ট (১৭৭টি আসন)
• সংসদীয় আসন	১৩ লোকসভা
• হাইকোর্ট	পাঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্ট
আয়তন	
• মোট	৫০,৩৬২ বর্গকিমি (১৯,৪৪৫ বর্গমাইল)
• এলাকা ক্রম	২০তম
জনসংখ্যা (২০১১)	
• মোট	২৭,৭৪৩,৩৩৮
• ক্রম	১৬তম
• ঘনত্ব	৫৫০/কিমি২ (১,৪০০/বর্গমাইল)
• সাক্ষরতা	৭৬.৬৮%
সময় অঞ্চল	আইএসটি (ইউটিসি+০৫:৩০)
আইএসও ৩১৬৬ কোড	IN-PB
সরকারি ভাষা	পাঞ্জাবি
ওয়েবসাইট	www.punjab.gov.in

বনোয়ারিলাল পুরোহিত
গভর্নর

ভগবন্ত মান
মুখ্যমন্ত্রী

কেন্দ্রবিন্দু

পাঞ্জাব

শান্ত জাবালি

ধর্মীয়-সংস্কৃতির বৈচিত্র্যময় এক রাজ্য পাঞ্জাব। নিজস্ব সমৃদ্ধি আর সৃজনশীল মানুষের এক অপূর্ব সমাহার। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য যেমন আপনাকে মুগ্ধ করে স্নায়ুবৃত্তির মন্থরতা জয় করবে, তেমনি ইতিহাসসমৃদ্ধ করবে আপনার জ্ঞানরাজ্যকে, তাঁদের উষ্ণ অভ্যর্থনার সাথে রন্ধনশিল্পের অপূর্ব স্বাদ নিঃসন্দেহে মোহিত করে তুলবে আপনাকে। পাঞ্জাব ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে অবস্থিত এবং সবচেয়ে সমৃদ্ধ রাজ্যগুলোর মধ্যে অন্যতম। 'পাঞ্জাব' দুটি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত। পুঞ্জ (পাঁচ) + আব (জল) অর্থাৎ পাঁচটি নদীর ভূমি দিয়ে তৈরি। পাঞ্জাবের এই পাঁচটি নদী হলো সুতলজ, বিয়াস, রাভি, চেনাব এবং ঝিলাম। বর্তমানে পাঞ্জাবে সুতলজ, রাভি এবং বিয়াস এই তিনটি নদী প্রবাহিত হলেও অন্য দুটি পাকিস্তানের পাঞ্জাবের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। পাঞ্জাব রাজ্য তিনটি অঞ্চলে বিভক্ত : মাঝা, দোয়াবা এবং মালওয়া

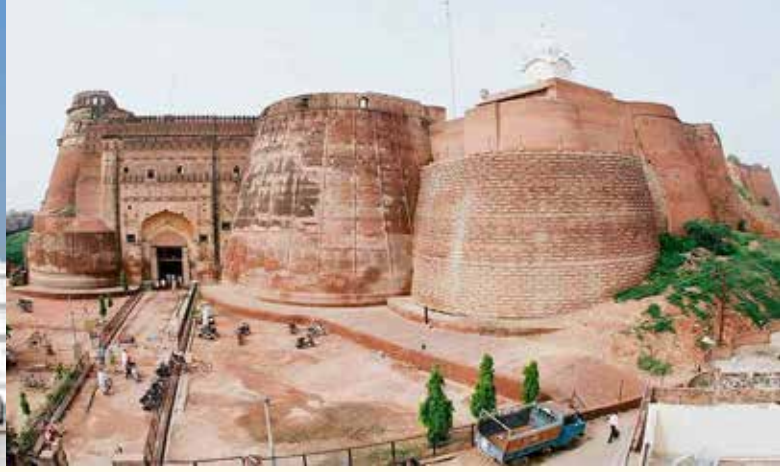

১৯৪৭ সালের দেশভাগের সময় পাঞ্জাব ভয়াবহ ক্ষতির সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও স্বাধীনতার পরে যথেষ্ট অর্থনৈতিক উন্নয়ন হয়। সবুজ বিপ্লবকে পাঞ্জাবের জনগণ বিস্তীর্ণ করে তোলে। পাঞ্জাবিরা ভারতীয় জনসংখ্যার ২.৫% এরও কম হওয়া সত্ত্বেও তাদের মাথাপিছু আয় ভারতের মোট জাতীয় গড় আয়ের প্রায় দ্বিগুণ। বর্তমানে পাঞ্জাব রাজ্য জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তায় অনস্বীকার্য অবদান রেখে চলছে। ভারতের খাদ্যশস্যের মোট চাহিদার প্রায় দুই তৃতীয়াংশ এবং দেশীয় দুধের ক্ষেত্রে এক তৃতীয়াংশ অবদান রাখে। এছাড়াও গম উৎপাদনে অন্যান্য রাজ্যগুলোর তুলনায় শীর্ষস্থানীয়। পাঞ্জাবের অর্থনীতির প্রধান ভিত্তি কৃষি হলেও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, বৈদ্যুতিক পণ্য, আর্থিক পরিষেবা, মেশিন টুলস, টেক্সটাইল, সেলাই মেশিন ইত্যাদি তৈরিতে অসামান্য অবদান রেখে চলছে। তাদের কঠোরশ্রম, অধ্যাবসায়, ত্যাগের কারণে আজ তারা ভারতের সবচেয়ে সমৃদ্ধ জাতিগুলোর মধ্যে অন্যতম।

পাঞ্জাবের স্থাপত্যশিল্প-নির্মাণকৌশল-অবকাঠামোর উন্নয়ন ভারতের মধ্যে অনন্য বলে মনে করা হয়। এর মধ্যে রয়েছে সড়কপথ, রেল, বিমান এবং নদী পরিবহণ সংযোগ যা সম্পূর্ণ অঞ্চলজুড়ে বিস্তৃত। অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় পাঞ্জাবে ভারতের সর্বনিম্ন দারিদ্র্যের হার। এমনকি সম্প্রতি ভারত সরকারকর্তৃক সংকলিত পরিসংখ্যানগত তথ্যের ওপর নির্ভর করে সেরা রাজ্যের কর্মক্ষমতা পুরস্কার অর্জন করে।

জনসংখ্যা

ভারতের ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুসারে, পাঞ্জাবের মোট জনসংখ্যা ২,৭৭,৪৩,৩৩৮। আর দশ বছরে (২০০১ থেকে ২০১১ পর্যন্ত) জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ১৩.৮৯%। পাঞ্জাবরা আর্য, পারস্য, গ্রিক, আফগান এবং মঙ্গোলসহ বেশ কয়েকটি জাতিসত্তার মিশ্রণ।

ভৌগোলিক অবস্থান

রাজ্যের মোট আয়তন ৫০,৩৬২ বর্গকিলোমিটার (১৯,৪৪৫ বর্গমাইল)। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে গড় উচ্চতা ৩০০ মিটার, দক্ষিণ-পশ্চিমে ১৮০ মিটার, উত্তর-পূর্ব সীমান্তের চারপাশে ৫০০ মিটার পর্যন্ত।

অবস্থান

পাঞ্জাব উত্তর অক্ষাংশে ২৯.৩০ ডিগ্রি থেকে ৩২.৩২ ডিগ্রি পর্যন্ত এবং পূর্ব দ্রাঘিমাংশে ৭৩.৫৫ ডিগ্রি থেকে ৭৬.৫০ ডিগ্রি পর্যন্ত বিস্তৃত। পাঞ্জাবের পশ্চিমে পাকিস্তান, উত্তরে জম্মু ও কাশ্মির, উত্তর-পূর্বে হিমাচল প্রদেশ এবং দক্ষিণে হরিয়ানা ও রাজস্থান।

জলবায়ু

প্রাকৃতিক ঋতু ছয়টি হলেও পাঞ্জাবে তিনটি ঋতুর এক অভূতপূর্ব সংমিশ্রণ রয়েছে। গ্রীষ্মতাপ, বর্ষাবৃষ্টি এবং শীতঠান্ডার সুষম মিলনে প্রাকৃতিক অপার্থিব নান্দনিকতা দান করে। তিনটি ঋতুর স্বাতন্ত্র্য এমনভাবে প্রকট থাকে যে প্রতিটি ঋতুর নীরব পরিবর্তনকে খুব সহজেই পর্যবেক্ষণ করা যায়। পাঞ্জাবে গ্রীষ্ম এবং শীত উভয়ের অনুভূতি অসাধারণ। এমনকি এখানে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টিপাত রাজ্যের মাটিকে উর্বরে পরিণত করে। হিমালয়ের পাদদেশে রাজ্যের অবস্থান হওয়ায় দরুন এই অঞ্চলে ভারী বৃষ্টিপাত হয়। পাহাড় থেকে দূরে অবস্থিত অঞ্চলগুলোতে বৃষ্টিপাত খুবই কম, পক্ষান্তরে সেখানে তাপমাত্রাও বেশি।

গ্রীষ্মকাল–এপ্রিলের মাঝামাঝি থেকে জুন পর্যন্ত। বর্ষাকাল–জুলাইয়ের শুরু থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। অক্টোবর মাস শীত মৌসুমের সূচনা করে। ডিসেম্বরের পর থেকে নিয়মিত শীত পড়ে। পাঞ্জাবের উল্লেখযোগ্য প্রধান উৎসব এই সময়ের মধ্যে হয়ে থাকে। যেমন লোহরি, হোল্লা মহল্লা, দীপাবলি এবং দশোরার মতো অনুষ্ঠানগুলো।

ভাষা

রাজ্যের সরকারি ভাষা পাঞ্জাবি। এটি বিশ্বের দশম বহুল প্রচলিত ভাষা এবং এশিয়ার চতুর্থ সর্বাধিক কথ্যভাষাও। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগুলোর মধ্যে এটিই একমাত্র জীবন্ত ভাষা যা সম্পূর্ণরূপে টোনাল ভাষা। পাঞ্জাবি ভাষা গুরুমুখী লিপিতে লেখা হয়। এছাড়াও পাঞ্জাবি ভাষার পাশাপাশি হিন্দি, উর্দু, ইংরেজি কথ্য ভাষার প্রচলন রয়েছে।

রাজ্যের রাজধানী

পাঞ্জাব ও হরিয়ানা রাজ্যের রাজধানী চণ্ডীগড়, যা সরাসরি কেন্দ্র থেকে শাসিত হয়। স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে যে শহরগুলোকে প্রাথমিক পরিকল্পনার অংশ হিসেবে নির্মাণ করা হয়েছে তার মধ্যে চণ্ডীগড় অন্যতম। বিংশ শতাব্দীতে এসেও ভারতের নগর পরিকল্পনা ও আধুনিক স্থাপত্যের অন্যতম সেরা নিদর্শন হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে এই শহর। বিখ্যাত ফরাসি স্থপতি 'লে করবুসিয়ার' এর পরিকল্পনায় এই শহরের সৌন্দর্য লুকিয়ে আছে। শিবালিকের পাদদেশে এর অবস্থান হওয়ায় প্রকৃতির সাথে আধুনিক স্থাপত্যশিল্পের এক অভিনব সংমিশ্রণ এই শহরকে স্বর্গীয় সৌন্দর্য দান করেছে। ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী শ্রী জওহরলাল নেহেরুর স্বপ্নের শহর এই চণ্ডীগড়।

শহরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছিল ১৯৫২ সালে। মার্চের ১৯৪৮ সালে পাঞ্জাব সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে পরামর্শ করে, শিবালিক পাদদেশের এলাকাটিকে নতুন রাজধানীর জন্য স্থান হিসেবে নির্বাচন করে। আম্বালা জেলার ১৮৯২-৯৩ সালের গেজেট অনুসারে আম্বালা জেলার পূর্ব অংশ এই শহরের অংশ বিশেষ ছিলো। পরবর্তীকালে ১৯৬৬ সালের দিকে পাঞ্জাব, হরিয়ানা এবং হিমাচল রাজ্যের সীমানা নির্ধারণের সময় আম্বালা জেলা ত্রিখণ্ড হয়ে পড়ে। পাঞ্জাব এবং হরিয়ানা উভয়েরই রাজধানী হয় চণ্ডীগড়। এটি সরাসরি কেন্দ্রশাসিত হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছিল তখন।

শহর

পাঞ্জাবে মোট ২৩টি জেলা, ১৬৮টি সংবিধিবদ্ধ শহর এবং ৬৯টি সেন্সাস টাউন রয়েছে। অর্থাৎ পাঞ্জাবে মোট ২৩৭টি শহর রয়েছে। পাঞ্জাবের প্রধান আকর্ষণীয় শহরগুলোর মধ্যে রয়েছে মোহালি, লুধিয়ানা, অমৃতসর, পাতিয়ালা এবং জলন্ধর।

বিশ্বসভ্যতার ইতিহাসে প্রথম এবং প্রাচীনতম সভ্যতাগুলোর মধ্যে সিন্ধু সভ্যতা অন্যতম। পাঞ্জাবের বেশিরভাগ অঞ্চলজুড়ে এটি বিস্তৃত ছিল, এমনকি হরপ্পা এবং মহেঞ্জোদারোর মতো প্রাচীন ঐতিহাসিক শহরগুলোও এখন পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশের অংশবিশেষ।

ইতিহাস

'পাঞ্জাব' শব্দের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় 'ইবনে বতুতার লেখা থেকে, যিনি চতুর্দশ শতাব্দীতে এই অঞ্চলে ঘুরতে আসেন। ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ব্যাপকভাবে পাঞ্জাব শব্দটি ব্যবহৃত হয় এবং 'তারিখ-ই-শের শাহ সুরি' (১৫৮০) গ্রন্থেও শব্দটি ব্যবহৃত হয়, এই গ্রন্থে মূলত 'পাঞ্জাবে শের খান'-এর দুর্গ নির্মাণের কাহিনি বর্ণনা করা হয়েছে। আবুল ফজল এর 'আইন-ই-আকবরী'-এর প্রথম গ্রন্থে 'পাঞ্জাব' শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়, যেখানে 'পাঞ্জাব'-কে মূলত লাহোর এবং মুলতান প্রদেশের অংশ হিসেবে পাওয়া যায়। আবুল ফজল ঐ গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে একটি অধ্যায়ের শিরোনাম 'পঞ্জনাদ' শব্দটি ব্যবহার করেন। মহাকাব্য মহাভারতের সংস্কৃত শব্দ হিসেবে 'পাঞ্জাব' শব্দটির প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়, যেখানে 'পাঞ্জাব'কে 'পঞ্চ-নাদ' হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে, যার অর্থ 'পাঁচটি নদীর দেশ'।

মুঘল রাজা জাহাঙ্গীর 'তুজক-ই-জানহাগিরি'তে পাঞ্জাব শব্দটিকে ব্যাখ্যা করেন, যা ফার্সি থেকে উদ্ভূত এবং ভারতের তুর্কি বিজেতাদের দ্বারা প্রবর্তিত হয়েছে, যার আক্ষরিক অর্থ হলো 'পাঁচ' (পাঞ্জ) 'জল' (আব) অর্থাৎ পাঁচটি নদীর জল। যা পাঞ্জাবের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হওয়া পাঁচটি নদীকে উল্লেখ করে। পাঁচটি নদী প্রবাহিত হওয়ার কারণে এই অঞ্চলের ফসলি জমি অত্যন্ত উর্বর ছিলো। ফলে ব্রিটিশ ভারতের সময় থেকেই পাঞ্জাব শস্যভাণ্ডারে পরিণত হয়েছিল।

বিশ্বসভ্যতার অন্যতম প্রাচীন শহরের সাথে বর্তমান পাঞ্জাবের যোগসাজস রয়েছে। ফলে বর্তমান পাঞ্জাব সংস্কৃতির এক উর্বর রাজধানীতে পরিণত হয়েছে। পাঞ্জাবি ভাষার উৎপত্তি ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা পরিবারে যার মধ্যে ফার্সি এবং ল্যাটিন অন্তর্ভুক্ত ছিল। পাঞ্জাব জাতিগত ও ধর্মীয় বৈচিত্র্যের রাজ্য, এমনকি এটি অনেক ধর্মীয় আন্দোলনেরও জন্মস্থান। শিখধর্ম, বৌদ্ধধর্ম এবং ইসলামের সুফি মাজহাবের মতো গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় মতগুলো প্রসারতা পেয়েছে এই ভূমি থেকে।

১৯৪৭ সালের দেশভাগের সময়ে বাংলার মতোই পাঞ্জাবের মধ্য দিয়ে ভারত-পাকিস্তানের সীমান্ত সীমানা নির্ধারণ করা হয়। রাজ্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম পশ্চিম অংশ পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশে এবং বেশিরভাগ শিখ পূর্ব অংশ ভারতের পাঞ্জাব রাজ্যের অংশ হয়। এই বিভাজনে অসংখ্য মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছিল এমনকি আন্তঃসাম্প্রদায়িক সহিংসতা দেখা দিয়েছিল। যেমন অনেক শিখ, হিন্দু পশ্চিমে বাস করত এবং অনেক মুসলমান পূর্বে বাস করত। এদের দেশান্তরে এই সমস্যার সৃষ্টি হয়। পাতিয়ালাসহ বেশ কয়েকটি ছোট রাজ্য তখন ভারতের পাঞ্জাবের সাথে সংযুক্ত করা হয়। ১৯৫০ সালে পাঞ্জা কে ভেঙে দুটি পৃথক রাজ্যে রূপান্তর করা হয়। রাজ প্রদেশ, পাতিয়ালা, নাভা, জিন্দ, কাপুরথালা, মালেরকোটলা, ফরিদকোট, কলসিয়া রাজ্যগুলিকে একটি নতুন রাজ্য পাতিয়ালা এবং পূর্ব পাঞ্জাব স্টেটস ইউনিয়ন (পিইপিএসইউ) হিসাবে গঠন করা হয়। এটিই বর্তমান পাঞ্জাব। পাঞ্জাবের কয়েকটি রাজ্য ও কাংড়া জেলাকে নিয়ে হিমাচল রাজ্য গঠন করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৫৬ সালের দিকে পাঞ্জাব রাজ্যের হিমালয়ের বেশ কয়েকটি উত্তরের জেলা হিমাচল প্রদেশের সাথে সংযুক্ত করা হয়।

সংস্কৃতি

পাঞ্জাব বিশ্বের অন্যতম প্রাচীনতম এবং সমৃদ্ধ সংস্কৃতিগুলির মধ্যে একটি। পাঞ্জাবি কবিতা, দর্শন, আধ্যাত্মিকতা, শিক্ষা, শিল্পকলা, সঙ্গীত, রন্ধনপ্রণালী, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, সামরিক সমরাস্ত্র, স্থাপত্য, সামাজিক ঐতিহ্য এবং ইতিহাসে এর বৈচিত্র্যতার স্পষ্ট স্বতন্ত্রতা লক্ষ্যণীয়। পাঞ্জাবের (পাঞ্জাবি) মানুষের জীবনধারণে মানবীয় মমতা এবং আধ্যাত্মিক চেতনার অপূর্ব সংমিশ্রণ রয়েছে। যদিও পাঞ্জাবিরা তাদের সংস্কৃতি-প্রথা সংরক্ষণে সর্বদা অটুট এবং তাদের এই জীবনপদ্ধতি প্রাচীন সংস্কৃতি–প্রথা-সভ্যতার বহু-বর্ণের ঐতিহ্যকে প্রতিনিধিত্ব করে। পাঞ্জাবের একজন অতিথিকে ঈশ্বরের প্রেরিত প্রতিনিধি হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং খুব যত্নের সাথে তার দেখাশোনা করা হয়।

পাঞ্জাবিরা অসংখ্য ধর্মীয় এবং মৌসুমী উৎসব উদযাপন করে থাকে। এর মধ্যে দশেরা, দিওয়ালি, বৈশাখী উৎসব অন্যতম। ধর্মীয়ভাবে গুরুদের (শিখধর্মের ১০ জন ধর্মীয় নেতা) সম্মানে বার্ষিকী অনুষ্ঠান খুবই ঝাঁকঝমকপূর্ণ হয়ে থাকে। এই অনুষ্ঠানে নাচের মাধ্যমে আনন্দ-উচ্ছ্বাস প্রকাশ করা হয়। সবচেয়ে জনপ্রিয় নাচের মধ্যে ভাংড়া, ঝুমার

ঘটনাপঞ্জি ❖ মে

মান্না দে

০১ মে ১৯১৯	❖	গায়ক মান্না দে-র জন্ম
০২ মে ১৯২১	❖	সত্যজিৎ রায়ের জন্ম
০৩ মে ১৯১৩	❖	দাদা সাহেব ফালকের জন্ম
০৪ মে ১৮৬১	❖	পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর জন্ম
০৭ মে ১৮৬১	❖	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম
১০ মে ১৮৮২	❖	গুরুসদয় দত্তর জন্ম
১০ মে ১৯০৫	❖	পঙ্কজ মল্লিকের জন্ম
১৪ মে ১৯২৩	❖	চলচ্চিত্র পরিচালক মৃণাল সেনের জন্ম
১৫ মে ১৮১৭	❖	মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম
১৭ মে ১৯১৩	❖	রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার লাভ
১৯ মে ১৯০৮	❖	মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম
২১ মে ১৯৯১	❖	রাজীব গান্ধীর মৃত্যু
২২ মে ১৭৭২	❖	রাজা রামমোহন রায়ের জন্ম
২৪ মে ১৮৯৯	❖	কাজী নজরুল ইসলামের জন্ম
২৭ মে ১৯৬৪	❖	পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর মৃত্যু
৩১ মে ১৯২৮	❖	ক্রিকেটার পঙ্কজ রায়ের জন্ম

এবং সামী অন্যতম। পাঞ্জাবি লোকসংস্কৃতি ঐতিহ্যে গিদ্দা খুবই জনপ্রিয় একটি অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে নারীদের মাধ্যমে হাস্যরসাত্মক নাচ-গানের আয়োজন করা হয়। এছাড়াও শিখ ধর্মীয় সঙ্গীতের পাশাপাশি মুঘলদের আধাশাস্ত্রীয় সংস্কৃতি যেমন খেয়াল নৃত্য, ঠুমরি, গজল এবং কাওয়ালি অনুষ্ঠানগুলো জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

পাঞ্জাবি পুরুষদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক হলো 'পাঞ্জাবি কুর্তা' এবং 'তেহমত' যা আধুনিক পাঞ্জাবে কুর্তা এবং পায়জামা হিসেবে ব্যবহৃত হয়। মহিলাদের জন্য ঐতিহ্যবাহী পোশাক হলো পাঞ্জাবি সালোয়ার স্যুট যা ঐতিহ্যবাহী পাঞ্জাবি ঘাগরাকে ধারণ করে। এর পাশাপাশি পাটিয়ালা সালোয়ারও বেশ জনপ্রিয়।

সাহিত্য

পাঞ্জাবিদের মনস্থাত্ত্বিকতার সৌন্দর্য পরিস্ফুটিত হয় কবিতার মধ্যে দিয়ে। পাঞ্জাবি কবিতাগুলোর গভীর্র ভাবার্থ, উপমা, অলংকারিক শব্দের অসাধারণ সংযোজন, শব্দের নান্দনিক উপস্থাপনা কবিতাগুলোকে বিখ্যাত করে তুলেছে। পাঞ্জাবি কবিতা ও সাহিত্যের অসংখ্য সংকলন বিশ্বজুড়ে বহু ভাষায় অনূদিত হচ্ছে। পাঞ্জাবি সাহিত্যের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি হলো পবিত্র 'গুরু গ্রন্থ সাহেব'।

সংগীত

সংস্কৃতি-রন্ধনশিল্প-ইতিহাসের পাশাপাশি সঙ্গীতে সমৃদ্ধ পাঞ্জাব। ভারতীয় শাস্ত্রীয়সংগীতের সবচেয়ে পুরনো এবং মর্যাদাপূর্ণ উৎসব 'হরবল্লভ সংগীত' পাঞ্জাবে আয়োজিত হয়। কণ্ঠসংগীতের দুটো ঘরানার জন্ম হয়েছে এখান থেকে। পাঞ্জাবের সংগীতে যেমন ধ্রুপদী প্রভাব রয়েছে তেমনি আছে লোকগান আর রাগদারীর ছোঁয়া।

রন্ধনপ্রণালী

পাঞ্জাবের সংস্কৃতির মতোই রন্ধনশিল্প বেশ প্রসিদ্ধ। এই রন্ধনশিল্প পাঞ্জাবের বাইরেও সমগ্র ভারত এমনকি এশিয়া জুড়েও এর খ্যাতি রয়েছে। পাঞ্জাবি রন্ধনপ্রণালী ধনী ব্যবসায়ীদের নজরে আসে এবং তারা এই খাতে বিনিয়োগ করা শুরু করেন। বানিজ্যিকরণের ফলশ্রুতিতে পাঞ্জাবের খাবারের সুখ্যাতি সবদিকে ছড়িয়ে পড়ে। জনপ্রিয় বিখ্যাত খাবারগুলোর মধ্যে রয়েছে 'সারসো কা সাগ' এবং 'মাক্কি দি রোটি' ইত্যাদি।

পাঞ্জাবের অর্থনীতি প্রধানত কৃষিপ্রধান এবং সিন্ধু সভ্যতার অন্যান্য নিদর্শনগুলোর মধ্যে ঐতিহাসিকভাবে শস্যভাণ্ডারের উপস্থিতি লক্ষ্যণীয়। দুগ্ধজাত খাবার, খামিরবিহীন রুটি, ডাল, সবজি এবং মাংসের তরকারি এগুলো রাজ্যের গ্রামীণ রন্ধনশিল্পকে প্রতিনিধিত্ব করে। যদিও বর্তমানে বিদেশী রন্ধনশিল্পের সংমিশ্রনে খাবারের স্বাদে অন্যন্যতা যোগ হয়েছে। যেমন চাল এবং গ্রেভি'র মতো খাবারগুলো। ফলে পাঞ্জাবি খাবার দেশের পাশাপাশি বিশ্বের সবচেয়ে সমৃদ্ধ খাবারে পরিণত হয়েছে। রান্নার ক্ষেত্রে সর্বদা সতেজ শাকসবজি এবং মাংস রান্নায় প্রচুর পরিমাণে দুধ, দই, মাখন এবং ক্রিমের ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এছাড়াও পাঞ্জাবিরা উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের রন্ধনপ্রণালীতে মুঘলাই মসলার রেসিপিতে একটি সংমিশ্রণ তৈরি করেছে। ফলে পোল্ট্রি এবং মাটনের খাবার আরো সমৃদ্ধ হয়েছে। সর্বব্যাপী পাঞ্জাবের 'তান্দুরি চিকেন' খুবই জনপ্রিয়।

নিঃসন্দেহে ভোজন রসিকদের জন্য পাঞ্জাব খুবই পছন্দনীয় স্থান হতে পারে। পাঞ্জাবিদের উষ্ণ অভ্যর্থনা, আতিথেয়তা আপনাকে অবশ্যই মুগ্ধ করে তুলবে। আপনার জন্য তাদের সংস্কৃতির ঐতিহাসিক খাবারগুলো প্রস্তুত করা হবে। তাদের বিশ্বাস যে খাদ্য সাম্প্রদায়িক বন্ধনের কেন্দ্রবিন্দু। ল্যাঙ্গার (গুরু অমরদাস এর প্রবর্তিত ধর্মীয় রান্নাঘর)– যেখানে যে কোনো সম্প্রদায়ের মানুষ খাবার গ্রহণ করতে পারেন। এটি প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই সমস্ত গুরুদ্বারগুলোতে সংযোজন করা হয়। যেন সেখানে সমস্ত ধর্মের ভক্তরা খাবার তৈরি এবং পরিষেবাতে অংশগ্রহণ করতে পারে।

পর্যটন

আপনি যদি একজন ভ্রমণ পিপাসু হয়ে থাকেন, তাহলে আপনার জীবনের একটুক্ষণের জন্যে হলেও পাঞ্জাব ঘুরে আসা প্রয়োজন। পাঞ্জাব যেমন প্রাকৃতিক এক স্বর্গীয় লীলাভূমি, একই সাথে ঐতিহাসিকভাবে খুবই সমৃদ্ধ। ধর্মীয় জীবনের বৈচিত্র্যময়তার আধার। ১৯৪৭ এর দেশভাগের কিছু অনুভূতি আপনাকে একটু হলেও আন্দোলিত করে তুলবে। সেই সাথে পাবেন পাঞ্জাবিদের মুগ্ধতার আতিথেয়তা। ভ্রমণের প্রতিটি বাঁকে আপনি পাবেন নতুন নতুন রোমাঞ্চকর অনুভূতি। তবে একজন ভ্রমণ পিপাসু মানুষের জন্য অক্টোবর থেকে মার্চের শেষ পর্যন্ত পাঞ্জাব ভ্রমণের সেরা সময়।

ঐতিহাসিকভাবে পাঞ্জাবিরা শিখ ধর্ম, বৌদ্ধধর্ম এবং সুফিবাদের মতো একাধিক ধর্মীয় আন্দোলনের জন্ম দিয়েছে । পাঞ্জাবে যেমন চিত্তাকর্ষক দুর্গ-প্রাসাদ, প্রাচীন স্মৃতিস্তম্ভ, বিস্ময়কর স্থাপত্যশিল্প রয়েছে। তেমনি অনেক যুদ্ধক্ষেত্রের স্বয়ং স্বাক্ষ্য বহন করে পাঞ্জাবের ভূমি। পাঞ্জাবের বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ভ্রমণস্থান হলো– অমৃতসর, গুরুদাসপুর, পাঠানকোট, কাপুরথালা, জলন্ধর, লুধিয়ানা, এসএএস নগর ও এসবিএস নগর, পাতিয়ালা, বাথিন্ডা, রূপনগর, আনন্দপুর সাহেব, হোশিয়ারপুর, সাঙ্গরুর, ফতেহগড় সাহেব ইত্যাদি।

পাঞ্জাবের জাদুঘর

জাদুঘর যে কোন রাষ্ট্র-জাতি-সমাজের অতীতের সৃষ্টি-কৃষ্টি-সংস্কৃতির অতীতের গৌরবময় দিনগুলোকে ফুটিয়ে তোলে। পাঞ্জাব অবশ্যই অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী রাজ্য এবং সেখানকার জাদুঘরগুলোই এই সমৃদ্ধকে সংরক্ষণ করে চলেছে। কয়েকটি জাদুঘর ও আর্ট গ্যালারি হলো– মেডেল গ্যালারি এবং স্টাফড প্রাণী গ্যালারি, শিশমহল, কুইলা মোবারক, মিউজিয়াম দেওয়ান খানা কাদিম, বানাসার বাগ, মহারাজা রঞ্জিত সিং মিউজিয়াম, সামার প্যালেস, রাম বাগ, প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘর, সাধু আশ্রম, শ্রী গুরু তেগ বাহাদুর মিউজিয়াম, শহিদ ভগত সিং মিউজিয়াম, খটকার কালান, নওয়ানশহরসহ আরো অনেক। ●

আপনার মতামত জানান

যোগাযোগের ঠিকানা ও ই-মেল

ফোন : ৫৫০৬৭৩০১-৮, ৫৫০৬৭৬৪৫-৯

এক্সটেনশন : ১১৪২

inf2.dhaka@mea.gov.in

ভারত বিচিত্রায় ব্যবহৃত বেশকিছু ছবি ও অলংকরণ ইন্টারনেট থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।

ভারত বিচিত্রা বিক্রয়ের জন্য নয়

জ্বালানি তেলে ভারত এখন রোলমডেল

মামুন রশীদ

বিশ্ববাজারে তেল এক অমূল্য সম্পদ। বাহ্যিক অবস্থা দেখে তেলকে হয়তো অন্য সম্পদের সঙ্গে তুলনা করা যায় না। কিন্তু তেলের দিগন্তবিস্তৃত ব্যাবহারিক প্রভাবের কথা বিবেচনা করলে বোঝা যায় এটি কেন একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং অমূল্য সম্পদ। গত তিন বছরে এ খাতটি এমন এক অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে যেখানে জ্বালানির ভূরাজনৈতিক প্রেক্ষাপটেরও আমূল পরিবর্তন হয়েছে। বিশ্ব জ্বালানি বাজারে নতুন করে সংকটের শুরু ২০১৯ সালে। অতিমারি কোভিড-১৯ এর ঢেউ রয়ে যায় ২০২০ সাল জুড়েও। অণুজীব আতঙ্কে স্থবির বিশ্ব যখন সংকট থেকে বেরিয়ে আসার পথ খুঁজছে তখনই নতুন সংকট রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ। দুটি দেশের মধ্যকার যুদ্ধ বিশ্ব অর্থনীতিকে আরও জটিল করে তোলে। সংকট শুরু হয় জ্বালানি তেল ঘিরেও। কারণ, আধুনিক পৃথিবীর গতিময়তা ধরে রাখতে প্রয়োজন জ্বালানি। এজন্য জীবাশ্ম জ্বালানিই এখনো প্রধান আশা।

বিকল্প জ্বালানির সংস্থান থাকলেও, তার ওপর বিশ্ব নির্ভরশীল হয়ে উঠতে পারেনি। তাই জীবাশ্ম জ্বালানির যোগানদাতা দেশগুলোর দিকেই তাকিয়ে তাকে বিশ্ব। জ্বালানি তেল উত্তোলনের দিক থেকে বিশ্বে সামনের সারিতে রয়েছে রাশিয়া। কিন্তু গত বছরের ফেব্রুয়ারিতে রাশিয়া ইউক্রেনে সামরিক হামলা চালালে পশ্চিমারা দেশটির তেলের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। ফলে বিশ্ববাজারে হু হু করে বাড়তে শুরু করে তেলের দাম। দীর্ঘ সাত বছর পর তা ব্যারেলপ্রতি ছাড়িয়ে যায় ১০০ ডলারে। একপর্যায়ে দাম ওঠে ব্যারেলপ্রতি ১৩৯ মার্কিন ডলার। জ্বালানি তেলের আমদানি খরচও বাড়ে। সেই সঙ্গে বাড়তে থাকে ডলারের বিনিময় হারও। ফলে দেশে দেশে তৈরি হয় ডলার-সংকট, কমে আসতে থাকে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ।

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের জেরে যখন বিশ্ববাজারে তেলের দর বাড়তে শুরু করে, তখন প্রাথমিক পর্যায়ে ভুগতে হয় ভারতকেও। কারণ দেশটির জ্বালানি তেলের চাহিদার ৭৫ থেকে ৮০ শতাংশই আমদানি করতে হয়। জ্বালানির দাম বাড়লে যেহেতু সব পণ্যেরই দাম বাড়ে, তাই ভারত নজর দিয়েছে জ্বালানি তেলে সক্ষমতা অর্জনের দিকে। জ্বালানি আমদানির বিপুল খরচ কমাতে ভারত হাঁটতে থাকে দেশে তেলের উৎপাদন বাড়ানো এবং অপরিশোধিত তেল পরিশোধনের পথে। আর এই লক্ষ্যে স্বাধীনতার ৭৬ বছরের মধ্যে ভারত আজ জ্বালানি তেলের ক্ষেত্রে শুধু সক্ষমতা অর্জনই নয়, স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের পথেও। ভারতের নিজস্ব তেল অনুসন্ধান শুরু হয়, ১৮৬৬ সালে ম্যাকলিপপ স্টুয়ার্ট কোম্পানির মি. গুডেনাফ অসমের উচ্চতর এলাকা জয়পুরের কাছে একটি তেলকূপ খনন শুরুর মাধ্যমে। কিছুদিনের ভেতর সেই তেলকূল থেকে তেল উত্তোলনও শুরু হয়। তবে লাভজনক না হওয়ায় তেল উৎপাদনের সেই উদ্যোগটি থমকে যায়। ব্যাবসায়িক ভিত্তিতে ভারত তেল উৎপাদনের দিকে নজর দেয় ১৮৮৯ সালে। অসাম রেলওয়ে এন্ড ট্রেডিং কোম্পানি (এআরটিসি) অসমের জয়পুরের প্রায় ত্রিশ বর্গমাইল এলাকাজুড়ে তেলক্ষেত্র অনুসন্ধান করে। এআরটিসি তেল উত্তোলন শুরু করে ডিগবয় তেলক্ষেত্র থেকে। এই তেলক্ষেত্রটিই স্বাধীনতার পূর্বে আবিষ্কৃত ভারতের একমাত্র তেলের খনি। এখান থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত উত্তোলন করা হয় ৫৮ লাখ টন অপরিশোধিত তেল। স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত ভারতের তেলক্ষেত্রগুলোর নিয়ন্ত্রণ ছিল বিদেশি কোম্পানিগুলোর হাতে। কিন্তু আজ অবস্থা পাল্টেছে। সঠিক এবং দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে ভারতে সরকারি উদ্যোগেই গড়ে উঠেছে বহু সংস্থা।

১৯৪৭ সালে যেখানে ডিগবয় তেলক্ষেত্র থেকে ভারতের বার্ষিক তেল উৎপাদন ছিল মাত্র ৫ লাখ টন। সেখানে গত শতকের নব্বইয়ের দশকে দেশটির বিভিন্ন তেলক্ষেত্র থেকে বার্ষিক তেল উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ৫ কোটি টনে। অবস্থার এই যে পরিবর্তন, এর পেছনে রয়েছে তেল উৎপাদন এবং পরিশোধনে সরকারি বিনিয়োগ। সঙ্গে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোরও এগিয়ে আসা। জ্বালানি তেলে বিনিয়োগও বেড়েছে। দেশের সঙ্গে রয়েছে বিদেশি বিনিয়োগও। এছাড়া তেল উৎপাদন, পরিশোধন, পরিবহন এবং বিপণনের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি নির্মাণ ও সরবরাহে সরকারি-বেসরকারি উভয় পুঁজিকেই কাজে লাগানো হয়েছে সঠিকভাবে।

ভারত ইতোপূর্বে তাদের প্রয়োজনীয় তেলের বড় অংশই আমদানি করত। সেখানে অপরিশোধিত তেলের পাশাপাশি পরিশোধিত তেলও ছিল। এখন তারা নিজেরা তেল উৎপাদনের পাশাপাশি অপরিশোধিত তেল এনে পরিশোধন করছে। এতে তাদের নিজেদের চাহিদা যেমন মিটছে, তেমনি রফতানিও করছে। আন্তর্জাতিক এনার্জি এজেন্সির একটি পরিসংখ্যান বলছে, ২০১৯ সালের বিশ্বে প্রতিদিন জ্বালানি তেলের চাহিদা ছিল প্রায় ১০ কোটি ব্যারেল। এই তেলের পাঁচভাগের একভাগই ব্যবহৃত হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। অর্থাৎ দেশটি প্রতিদিন গড়ে দুই কোটি ব্যারেল তেল ব্যবহার করে। জ্বালানি তেল ব্যবহারে যুক্তরাষ্ট্রের পরেই রয়েছে চীন এবং ভারত। চীনে প্রতিদিন পোড়ানো হয় এক কোটি তিন লাখ ব্যারেলের বেশি তেল এবং ভারতে প্রয়োজন হয় প্রায় ৫০ লাখ ব্যারেল তেল। বিশ্বে প্রাকৃতিক তেলের মোট মজুত রয়েছে এক দশমিক ৫৫ ট্রিলিয়ন ব্যারেল। যার মাঝে ভেনিজুয়েলায় রয়েছে সবচেয়ে বেশি তেলের মজুদ। দেশটিতে মজুত রয়েছে ৩০২.৮১

বিলিয়ন ব্যারেল জ্বালানি তেল। যা বিশ্বে মোট মজুত তেলের ১৮ ভাগ। সৌদি আরবে তেলখনিগুলোতে মজুত রয়েছে ২৬৭ দশমিক ০৩ বিলিয়ন ব্যারেল। যা বিশ্বের অপরিশোধিত জ্বালানি তেলের মোট মজুতের ১৬ ভাগ। ইরানের সংগ্রহে রয়েছে ১৫৫ দশমিক ৬০ বিলিয়ন ব্যারেল তেলের মজুদ। যা বিশ্বের মোট জ্বালানি তেলের সাড়ে নয় ভাগ। অর্থাৎ, সারা বিশ্বে যতো অপরিশোধিত তেল মজুত আছে, তার প্রায় অর্ধেকের কাছাকাছি তেল মজুত রয়েছে এ তিন দেশের কাছে। অন্যদিকে রাশিয়ার খনিগুলোতে রয়েছে ৮০ বিলিয়ন ব্যারেল অপরিশোধিত তেল। যা বিশ্বের মজুতকৃত অপরিশোধিত জ্বালানি তেলের প্রায় পাঁচ ভাগ। তেলের মজুতে অন্যান্য দেশ থেকে পিছিয়ে থাকলেও রাশিয়াই বিশ্বের শীর্ষ তেল উৎপাদনকারী দেশ। কারণ অন্যরা মজুত অনুযায়ী তাদের তেলক্ষেত্রগুলো থেকে তেল উত্তোলন করে না। কিন্তু রাশিয়া প্রতিদিন তাদের তেলক্ষেত্রগুলো থেকে ৭০ লাখ ব্যারেল তেল উত্তোলন করে। যা বিশ্বের চাহিদার সাত শতাংশ। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর পর রাশিয়ার উত্তোলনকৃত এই তেল নিয়েই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের মাথাব্যথা। যুদ্ধে লিপ্ত রাশিয়াকে চাপে রাখতে ইতোমধ্যে নানা ধরনের নিষেধাজ্ঞায় দেশটিকে জর্জরিত করা হয়েছে। তাদের উত্তোলিত তেলের ওপরও রয়েছে নিষেধাজ্ঞা। যুদ্ধের শুরুতে আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম বাড়তে বাড়তে একশ ডলার পেরুলেও পরবর্তীতের রাশিয়ার তেলের বাজারকে নিম্নমুখী করতে কৌশলগত কারণে কমানো হতে থাকে অপরিশোধিত তেলের দাম। যা এক পর্যায়ে নেমে এসেছিল ৬০ ডলারে। আর এই সুযোগটিকেই যথাযথ ভাবে কাজে লাগায় ভারত। তারা আন্তর্জাতিক বাজারে নির্ধারিত মূল্যসীমার চেয়েও অনেক কম দামে বা প্রতি ব্যারেল ৬০ ডলারের কমে রাশিয়ার তেল কেনার সুযোগ লুফে নেয়। সুযোগটিকে খুব সফলতার সঙ্গে কাজে লাগানোয় ভারত এরই মধ্যে রাশিয়ার তেলের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ক্রেতা। রাশিয়া থেকে তারা ইতোমধ্যে কিনেছে রেকর্ড পরিমাণ অপরিশোধিত তেল। পরিসংখ্যান বলছে, চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতেই রাশিয়া থেকে অপরিশোধিত জ্বালানি তেল আমদানি করেছে ৩.৩৫ বিলিয়ন ব্যারেল। ইকোনমিক টাইমসের একটি প্রতিবেদন বলছে, এপ্রিল মাসেও ভারত সবচেয়ে বেশি জ্বালানি তেল আমদানি করেছে রাশিয়া থেকে। সাম্প্রতিক সময়ে ভারত তার আমদানিকৃত জ্বালানি তেলের ৩৬ শতাংশই কিনেছে রাশিয়া থেকে। অথচ ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে ইউক্রেনে সেনা পাঠানোর আগে রাশিয়ার কাছ থেকে ভারত তাদের আমদানিকৃত জ্বালানি তেলের মাত্র শূন্য দশমিক ২ শতাংশ কিনেছিল। অথচ মাত্র এক বছরেই পরিস্থিতি পাল্টে গেছে।

২০২৩ সালে এসে ভারত যেমন রাশিয়া থেকে অপরিশোধিত তেল কেনা বাড়িয়েছে, তেমনি ইউরোপে বাড়িয়েছে নিজেদের পরিশোধিত তেল রপ্তানিও। চলতি বছরের এপ্রিলে ভারত প্রতিদিন প্রায় ৩৬ লাখ ব্যারেল পরিশোধিত জ্বালানি রফতানি করছে ইউরোপে। যা রফতানিতে তাদেরকে বৃহৎ তেল উৎপাদক দেশ সৌদি আরবের থেকেও এগিয়ে রেখেছে। ইউরোপও তার জ্বালানির বড় অংশই কিনত রাশিয়া থেকে। কিন্তু রুশ তেলে ইউরোপীয় ইউনিয়নের নিষেধাজ্ঞা তাদেরকেও জ্বালানি সংগ্রহে বিকল্প বাজার খুঁজতে বাধ্য করেছে। আর সেই শূন্যতা খুব ভালোভাবেই পূরণ করছে ভারত। অ্যানালিটিক্স ফার্ম কেপলারের একটি প্রতিবেদন বলছে, ভারত বর্তমানে ইউরোপের সবচেয়ে বড় পরিশোধিত জ্বালানি সরবরাহকারী। ভারতের অনেকগুলো তেল পরিশোধনাগার রয়েছে। তেল পরিশোধনের সক্ষমতায় তারা বিশ্বের চতুর্থ দেশ। এক্ষেত্রে সরকারের পাশাপাশি তাদের বেসরকারি খাতের তেল পরিশোধক কোম্পানি রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড ও নায়ারা এনার্জিও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এটা ভারতের সঠিক পরিকল্পনা ও কূটনৈতিক সক্ষমতারই প্রমাণ। কারণ ইউক্রেনের ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়ার অভিযোগে রাশিয়ার ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞার সুযোগটিই ভারত ভালোভাবে গ্রহণ করেছে। যখন রাশিয়ার তেলের ওপর নিষেধাজ্ঞায় অনেকেই রাশিয়ার অপরিশোধিত তেল কেনার সাহস করছে না। তখন কম দামে রাশিয়া থেকে অপরিশোধিত তেল আমদানি করে পরিশোধনের মাধ্যমে তারা নিষেধাজ্ঞা দেওয়া ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ বিভিন্ন দেশের কাছে বিক্রি করছে।

মধ্যপ্রাচ্যের তেল উৎপাদনকারী দেশগুলোসহ ওপেকভুক্ত দেশগুলো যখন জ্বালানি তেল উৎপাদনে ধীরে চলা নীতি অনুসরণ করছে, তখন ভারত পরিশোধিত জ্বালানি তেল বিক্রির মাধ্যমে ভূ-অর্থনীতিতে যেমন তেমনই ভূ-রাজনীতিতেও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছে। পশ্চিমাদের নিষেধাজ্ঞা না শুনে ভারত রাশিয়ার তেল কেনা বাড়িয়ে দেওয়ায় একদিকে তারা নিজেদের জ্বালানি সংকট এড়াতে পেরেছে তেমনি জ্বালানি তেলের ক্ষেত্রে বর্তমানে উন্নয়নশীল অনেক দেশের জন্যেই রোল মডেল হয়ে উঠেছে। জ্বালানি তেল উৎপাদন এবং অপরিশোধিত তেল আমদানি করে পরিশোধনের মাধ্যমে যে শক্তিশালী বলয় তৈরি করা সম্ভব, ভারত সে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। জ্বালানি তেলের মাধ্যমেই তারা সে প্রভাব বলয় তৈরির সম্ভাবনা জাগিয়ে তুলেছে। এক্ষেত্রে ভারতের দৃঢ় পররাষ্ট্রনীতিরও রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

নিষেধাজ্ঞার কারণে যখন অপরাপর দেশগুলো রাশিয়ার জ্বালানি তেল কেনার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি, তখন ভারত নিজেদের দৃঢ়তা প্রকাশের মতো সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সক্ষম হওয়ায়, তারা বর্তমানে তেলের বাজারে জায়ান্ট হিসেবে আবির্ভূত হওয়ার সুযোগ পেয়েছে। নিষেধাজ্ঞার মুখেও রাশিয়ার থেকে জ্বালানি সংগ্রহে ভারতের ভূমিকা নিয়ে পশ্চিমা দেশগুলোর উদ্বেগ-উৎকণ্ঠাকে ভারতীয় নেতৃবৃন্দ আমলে আনেনি। এক্ষেত্রে ভারতের আরও একটি বড় সফলতা তারা কোনো বিকল্পকেই হাতছাড়া করেনি। ফলে তাদের আমদানি ব্যয় কমেছে, ক্রেতাদের ব্যয়ের বোঝাও কমেছে।

> বর্তমানে জ্বালানির বাজারে একচ্ছত্র আধিপত্য না পেলেও দক্ষিণ এশিয়াসহ এশিয়ার বড় অংশে নিজেদের প্রভাব তৈরিতে সক্ষমতা অর্জন করেছে। ইউরোপে তারা পরিশোধিত জ্বালানির সবচেয়ে বড় জোগানদাতা। এই জায়গাটিতেই ভারতের পরিকল্পনা সফল

ভারত এক সময়ে ভারি শিল্প বিকাশে বড় পরিকল্পনা নিয়েছিল। তারা তাদের অভ্যন্তরীণ পণ্যের বিপণন ও বিক্রি বাড়াতে বিদেশি অনেক পণ্যের আমদানি বন্ধ ও সীমাবদ্ধ করে ফেলে। ফলে অটোমেকানিক বা ভারি শিল্পে ভারতের অবস্থান এখন অনেক পোক্ত। এটা সম্ভব হওয়ার পেছন রয়েছে দীর্ঘমেয়াদী রাষ্ট্রীয় নীতি। দেশটি প্রাইভেট সেক্টরকেও যথেষ্ট সুবিধা দিয়েছে, সঙ্গে বেসরকারি খাতের নিয়ন্ত্রণে বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানও তৈরি করেছে। ভারত সবসময়ই সবক্ষেত্রে গ্রহণ করেছে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা, এতে করে তাদের সফলতাও এসেছে। যা নতুন করে প্রমাণ হয়েছে বর্তমানে ভারতের জ্বালানি খাতের অবস্থানে। একটি সময় জ্বালানিতে একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল রাশিয়ার। যুক্তরাষ্ট্র তেল সম্পদে সমৃদ্ধ হলেও তারা বাইরে থেকে পেট্রল সংগ্রহ করে। কিন্তু বর্তমানের ভূ-অর্থনীতি পাল্টে গেছে। ভারত বর্তমানে জ্বালানির বাজারে একচ্ছত্র আধিপত্য না পেলেও দক্ষিণ এশিয়াসহ এশিয়ার বড় অংশে নিজেদের প্রভাব তৈরিতে সক্ষমতা অর্জন করেছে। ইউরোপে তারা পরিশোধিত জ্বালানির সবচেয়ে বড় জোগানদাতা। এই জায়গাটিতেই ভারতের পরিকল্পনা সফল। তারা বিশ্ব অর্থনীতিতে এ মুহূর্তে সবচেয়ে সম্ভাবনাময় অর্থনীতির দেশ। ভূরাজনৈতিক গুরুত্ব যেমন তাদের আছে তেমনি তাদের রয়েছে ভূ-অর্থনীতিকে প্রভাবিত করার ক্ষমতাও। ফলে পরিশোধিত তেল কেনার ক্ষেত্রে এখন ইউরোপের প্রধান ভরসা ভারত। পরিশোধিত পেট্রোলিয়াম রপ্তানিতেও শীর্ষ অবস্থানে এখন ভারত। অনেক দিন পর্যন্ত ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলোতে পরিশোধিত তেল সরবরাহের শীর্ষে ছিল সৌদি আরব। ভারত তাদের কর্মপরিকল্পনা দিয়ে মধ্যপ্রাচ্যের তেলসমৃদ্ধ এই দেশটিকে ছাড়িয়ে গিয়েছে। জ্বালানি সক্ষমতা অর্জন ছাড়া উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির পথে মসৃণভাবে এগিয়ে চলা কঠিন।

মামুন রশীদ ॥ সাংবাদিক ও কবি

ভারতের পনেরোটি উৎসব

এনাম রাজু

ফিচার

উৎসবে মুখরিত দেশ ভারত। বিপুল আয়তনের এ দেশটির প্রাণবন্ত সংস্কৃতির বৈচিত্র্যও ব্যাপক। ভারতের শিল্প-সংস্কৃতির ব্যাপক সমৃদ্ধি ও বিস্তৃতি সম্পর্কে জানতে অনেকেরই রয়েছে আগ্রহ। এসব উৎসব পালন ও উদ্‌যাপনের মধ্যদিয়েও এদেশের বিশালত্ত ও সম্প্রীতির বন্ধন উন্মোচিত হয়। একই সাথে ফুটে ওঠে গণতন্ত্রের চর্চা, মানুষ ও মানবতার জয়গানের দৃষ্টান্ত। একারণেই যেকোনো ভ্রমণপাগল মানুষের কাছেই এসব উৎসবে অংশ না নেওয়ায়ও বড় ধরনের অপ্রাপ্তি হয়ে থাকে। এর বাইরেও ভারতে আরও অসংখ্য অনুষ্ঠান রয়েছে। যা ভারতের ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে গভীরভাবে ধারণ করে। সংক্ষিপ্ত আলোচনার মাধ্যমে ভারতের পনেরোটি উৎসব ও অনুষ্ঠান সম্পর্কে জেনে নেই আমরা

দীপাবলি

ধর্ম, বর্ণ, জাতি নির্বিশেষে বেশকিছু উৎসব ভারতজুড়ে পালিত হয়ে থাকে। এর মধ্যে দীপাবলি উৎসব অন্যতম। দীপাবলি উৎসবের মধ্য দিয়ে সবার মধ্যে প্রতিফলিত হয় মঙ্গল, জাগ্রত হয় ভ্রাতৃত্ববোধ। 'দীপ' ও 'ওয়ালি' শব্দের সন্ধিরূপ দীপাবলি। দীপ অর্থ প্রদীপ ও ওয়ালি অর্থ সারি। অর্থাৎ দীপাবলি এর সমষ্টিগত অর্থ–প্রদীপের সারি। সারি সারি প্রদীপ জ্বালিয়ে পরিবার ও পরিবেশের সকল অন্ধকার দূর করা হয় এই উৎসব উপলক্ষে। সকল ভারতবাসী ছাড়াও এখন বিশ্বের অধিকাংশ মানুষের কাছে দীপাবলি আলোর উৎসব হিসেবে

পালিত হচ্ছে। একটি শুভ পূজার মাধ্যমে দিনের শুরু করে আলোর উৎসব উপভোগ করে, তারপরে নতুন ঐতিহ্যবাহী পোশাক, মিষ্টি এবং রং দেওয়া দিয়ে রাতকে স্বাগত জানানো হয়। বৈদ্যুতিক আলোর মালা আর রঙিন রঙ্গোলি দিয়ে সাজানো হয়ে থাকে ঘরবাড়ি।

দীপাবলির ইতিহাস প্রসঙ্গে পুরাণের সবচেয়ে জনপ্রিয় রাম, সীতা ও লক্ষ্মণের অযোধ্যায় ফেরার কাহিনি। এছাড়াও আরও গল্প আছে। রামায়ণ মতে, একদা এই দিনে অযোধ্যায় আলো জ্বেলে উৎসবে মেতেছিল। কারণ লঙ্কাকাণ্ড সমাধা করে রামচন্দ্র এই দিনেই অযোধ্যায় পৌঁছেছিলেন। শুনে ভারতবর্ষের প্রতিটি সন্তান শান্তির প্রতিশ্রুতি পেয়েছিলেন, ঘরে ঘরে কোটি কোটি সীতা আনন্দে আলো জ্বেলেছিলেন। এমনি এক অমাবস্যার রাতে শ্রীকৃষ্ণের হাতে নিহত হয়েছিলেন ত্রিলোকের ত্রাস নরকাসুর। ষোলো হাজার বন্দিনী নারী মুক্তি পেয়ে আবার সংসারে ফিরে এসেছিলেন, ঋষিরা আবার দিনের আলো দেখতে পেয়েছিলেন।

অন্যরকম কাহিনিও প্রচলিত। প্রজারঞ্জক রাজা ছিলেন মহাবলী। শক্তিমানও বটে। তার ভয়ে দেবতারাও শঙ্কিত। কিন্তু প্রজারা তাকে ভালোবাসে। ভীত দেবতাদের প্রার্থনায় বিষ্ণু বামন বেশে মহাবলীর সামনে এসে হাজির হলেন। মহাবলী জানতে চাইলেন তিনি কী চান। বামনরূপী বিষ্ণু বললেন– ত্রিপাদ ভূমি। দানশীল মহাবলী তাতে আপত্তি করলেন না। তিনি বামনের প্রার্থনা মঞ্জুর করে বললেন–বেশ, তাই নাও। বিষ্ণু এবার স্বরূপ ধারণ করলেন। এক পায়ে তিনি পৃথিবী অধিকার করলেন, আর এক পদক্ষেপে স্বর্গ অধিকৃত হলো। বিষ্ণু বললেন, তৃতীয় পদ কোথায় স্থাপন করি? মহাবলী বললেন, আমার মস্তকে। বিষ্ণুর পদভারে মহাবলী রসাতলে প্রোথিত হলেন। প্রজারা কান্নাকাটি শুরু করল। তাদের পীড়াপীড়িতে পরে বিষ্ণু প্রতি বছর একদিনের জন্য মহাবলীকে নিজের রাজধানীতে ফিরে যাবার অনুমতি দিলেন। সে দিনটিই দীপাবলি বা দেওয়ালি।

মহাভারতে পাওয়া যায়, বারো বছর বনবাস ও এক বছর অজ্ঞাতবাসের পর দীপাবলিতেই হস্তিনাপুরে ফিরে এসেছিলেন পাণ্ডবরা। সেই জন্য আলোর মালায় সাজানো হয়েছিল গোটা হস্তিনাপুরকে।

দীপাবলি শুধু সনাতনধর্মীদের নয়, শিখ এবং জৈন ধর্মাবলম্বীদেরও অনুষ্ঠান। জৈন ধর্মের প্রবর্তক মহাবীর ৫২৭ অব্দে দীপাবলির দিনে মোক্ষ (নির্বাণ) লাভ করেন। দীপাবলির দিনে শিখ ধর্মগুরু গুরু হরগোবিন্দ অমৃতসরে ফিরে আসেন। সম্রাট জাহাঙ্গীরকে পরাজিত করে গোয়ালিওর দুর্গ থেকে বায়ান্ন হিন্দু রাজাকে মুক্ত করে তার এই প্রত্যাবর্তনকে শিখগণ পালন করেন। তারা এই দিনকে 'বন্দী ছোড় দিবস'ও বলেন। দীপাবলি অমাবস্যার রাতে পালন করা হয়।

হোলি

বারো মাসে তেরো পার্বণের ন্যায় হিন্দুধর্মালম্বিরা মেতে ওঠে ঋতুভিত্তিক উৎসবে। এই সকল উৎসব ধর্মের গণ্ডি অতিক্রম করে সর্বব্যাপি ও সর্বমানবী রূপ নিয়েছে। হোলি উৎসবও তেমন একটি উৎসব। হোলিও অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে শুভশক্তির উত্থানের ইতিহাস ধারণ করে। এই উৎসব ধীরে ধীরে বিশ্ব পরিমণ্ডলে জনপ্রিয়তা অর্জন করছে। অগণিত রঙে একে অপরের গায়ে রং ছুড়ে ও প্রয়োগ করে হোলি উদ্‌যাপন করা হয়। এমনকি জলবন্দুক এবং জল বেলুনের একটি বন্ধুত্বপূর্ণ অস্ত্রের মাধ্যমে একে অপরের উপর জল ছুড়ে এবং ছিটিয়ে দিয়ে উৎসবটি খেলা হয়। হোলির গোলাপি, সবুজ এবং লাল রঙের মাধ্যমে বিশ্বে আনন্দের বার্তা পৌঁছে যায় এই উৎসবের মাধ্যমে।

এই উৎসবের ইতিহাসও পৌরাণিক এবং চমকপ্রদ। পৌরাণিক কাহিনিগুলোর দিকে ফিরে তাকালে এই হলি উৎসবকে ঘিরে দুইটি উল্লেখযোগ্য কাহিনি পাওয়া যায়। একটি প্রহ্লাদ ও হোলিকার কাহিনি এবং অন্যটি রাধা-কৃষ্ণের কাহিনি। কথিত আছে পৌরাণিক রাজা হিরণ্যকশিপু একদিন দাবি করে বসলেন যে, এখন থেকে তাকে ঈশ্বর হিসেবে অর্চনা বা পুজো করতে হবে। তিনি নিজেকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রভু দাবি করেন। কিন্তু বাদ সেধে বসল তার ছেলে রাজকুমার প্রহ্লাদ। সে মহান বিষ্ণু ছাড়া আর কাউকে ঈশ্বর মানতে নারাজ। রাজা তার ছেলেকে নানাভাবে চেষ্টা করলেন তার সামনে নতজানু করার কিন্তু প্রহ্লাদ তা প্রত্যাখান করে। ফলে রাজা ক্ষিপ্ত হয়ে তার সৈন্যবাহিনীকে নির্দেশ দেয় প্রহ্লাদকে হত্যা করার। এভাবে নানাভাবে রাজা ছেলেকে হত্যার চেষ্টা করে কিন্তু প্রতিবার তার চেষ্টা বিফলে যায়। নিরুপায় হয়ে দুষ্ট রাজা রাজকুমারকে হত্যার উদ্দেশে যজ্ঞের আগুনে নিক্ষেপের জন্য তার বোন হোলিকাকে নিযুক্ত করে। হোলিকা প্রতিজ্ঞা করে রাজকুমারকে হত্যার। সে ঈশ্বরের কাছ হতে বর পেয়েছিল এবং সেই বরের প্রেক্ষিতে সে জানত কখনো আগুনে পুড়বে না। সে প্রহ্লাদকে ধরে অট্টহাসি দিয়ে আগুনে ঝাঁপ দেয়। প্রহ্লাদ এবারও বিষ্ণুকে ডাক দেয় এবং বিষ্ণু এবারও তাকে বাঁচায়। কিন্তু আগুনে ভস্ম হয়ে যায় হোলিকা, এই থেকেই হোলি কথাটির উৎপত্তি।

অন্যদিকে রাধা-কৃষ্ণ কাহিনিও বেশ প্রচলিত। হিন্দু অবতার শ্রীকৃষ্ণ একদিন বৃন্দাবনে রাধা এবং তার সখীদের সঙ্গে খেলা করছিলেন। সে সময় হঠাৎ শ্রী রাধা এক বিব্রতকর অবস্থার মুখোমুখি হয়ে লজ্জিত হন। শ্রীকৃষ্ণের মাথায় তখন একটি বুদ্ধি আসে। তিনি রাধার লজ্জা ঢাকতে শ্রী রাধা এবং তার সখীদের সাথে আবির খেলা শুরু করেন। শ্রীকৃষ্ণ-শ্রীরাধা এবং তার সখীদের এই আবির খেলার স্মরণে হিন্দু সম্প্রদায় এই হোলি উৎসব পালন করে। উৎসবটি ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমা তিথিতে উদ্‌যাপিত হয়।

দশরা

দশরা উৎসব ভারতের অন্যতম সাংস্কৃতিক উৎসবের মধ্যে একটি। সমগ্র ভারতেই দশরা উৎসব ভিন্ন ভিন্ন প্রথা পালনের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। প্রদেশভেদে প্রথা আলাদা আলাদা হলেও এটি প্রধানত নারীশক্তির পূজার মধ্যে দিয়েই পালিত হয়। ভারতবর্ষে অনেক জায়গায় দশরা বিজয়াদশমী নামেও পরিচিত। নবরাতির দশরা দিনের সমাপ্তি, দশরার দশতম দিনে শেষ হয়। এই উৎসবের মূল আকর্ষণ হলো রাবণ এবং তার দুই ভাইয়ের কুশপুত্তলিকা পোড়ানো, যা রামায়ণের মহাকাব্যে যখন ভগবান রাম রাবণকে ধ্বংস করেন তার প্রতীক। মূর্তিগুলো আতশবাজি দিয়ে ভরা হয়, যার ফলে প্রায় ১০০ ফুট উঁচু-কাঠামোটি ভেঙে পড়ার সাথে সাথে বিকট শব্দের আওয়াজ হয়। এর পরে ভিড় থেকে উচ্চস্বরে চিয়ারও হয়, যা প্রতীকী কৃতিত্ব উদ্‌যাপন করে। দশরা উৎসব মূলত পালিত হয় অশুভর ওপর শুভর জয় বা দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করার জন্য। কিছু জায়গায়, দশরার পরের দিনগুলিকে রামলীলা নামক পথনাটকের মাধ্যমে সমগ্র রামায়ণ চিত্রিত করে চিহ্নিত করা হয়।

পৌরাণিক কাহিনিতে আছে, রামের জন্মের বহু আগে থেকেই নাকি রঘুকুলে পালিত হতো দশরা প্রথা। শোনা যায় যে রামের পূর্বপুরুষ রাজা রঘুর আমলের একটি ঘটনা এর জন্য দায়ী। রঘুর রাজ্যে ছিলেন দেবদূত নামের এক ঋষি। তার পুত্র শিক্ষা লাভ করতে গিয়েছিলেন ঋষি বরতনুর কাছে। গুরুকে গুরুদক্ষিণা দেওয়ার জন্য ব্যস্ত হন দেবদূত ঋষির পুত্র।

এদিকে বাধ্য হয়ে একটি অসম্ভব ইচ্ছা প্রকাশ করেন গুরুদেব। তিনি বলেন চৌদ্দটি বিষয়ে শিক্ষার দক্ষিণা হিসেবে তিনি একশ চল্লিশ লাখ স্বর্ণমুদ্রা পেতে চান। গুরুর ইচ্ছা পূরণে অযোধ্যায় দানবীর রাজা রঘুর শরণাপন্ন হন। কিন্তু ঘটনাচক্রে সেইদিনই ব্রাহ্মণদের দানে সব সোনা দিয়ে দেওয়ার কারণে রঘু সেই শিক্ষার্থীকে তিন দিন সময় ভিক্ষা দিতে বলেন। তারপর রাজা রঘু সোজা চলে যান ইন্দ্রের কাছে।

সব শুনে ইন্দ্র ডেকে পাঠান ধনদেবতা কুবেরকে। ইন্দ্রের কথামতো কুবের অযোধ্যা রাজ্যে সেদিন ধনবৃষ্টি শুরু করেন। শোনু এবং আপটি গাছের পাতাগুলো থেকে ঝরতে থাকে সোনার মোহর। মোহর একত্রিত করে সেই শিক্ষার্থীকে দিয়ে দেন রাজা রঘু। কিন্তু ছাত্রের কাছ থেকে শুধু ১৪০ লাখ স্বর্ণমুদ্রা চেয়ে ছিলেন তার গুরু। বাকিটা তিনি ফিরিয়ে দেন তার ছাত্রকে। আবার সেই ছাত্র সেই বাকি সোনার মুদ্রা ফিরিয়ে দেন রাজা রঘুকে।

এদিকে দানবীর রঘু সেই স্বর্ণমুদ্রাগুলো বিলিয়ে দেন তার প্রজাদের মধ্যে। আর ঘটনাচক্রে সেই দিনটি ছিল বিজয়া দশমীর দিন। আর সেদিন থেকে বিজয়া দশমীর দিনে শোনু এবং আপটি বৃক্ষের পাতা সৌভাগ্যের প্রতীক হিসেবে দেওয়ার প্রচলন আছে।

কেউ কেউ বলেন, দশ রাত্রে দশ দিন ধরে অবিরাম লড়াইয়ের পর দেবী দুর্গা মহিষাসুরকে বধ করেন। একারণে এই দিনে বিজয়ের দিন বিজয়াদশমী।

দশরা উৎসব আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষের দশমী তিথিতে উদ্‌যাপিত হয়।

জিরো মিউজিক ফেস্টিভ্যাল

অরুণাচল প্রদেশের জিরোতে জিরো সঙ্গীত উৎসব হয়। যা আপাতানি উপজাতি দ্বারা আয়োজিত হয় এটি একটি ওপেন-এয়ার কনসার্ট উৎসব। দর্শনার্থীরা ছোট ছোট তাঁবুতে থাকেন। যা উৎসবের আয়োজকরা সাজিয়ে রাখেন। কেউ কেউ নিজস্ব তাঁবুও নিয়ে আসে। চার দিন ধরে এই অনুষ্ঠান চলে। সারা বিশ্বের সঙ্গীত পরিবেশকরা উৎসব এলাকায় তাদের শো মঞ্চস্থ করে। সঙ্গীত উদ্‌যাপন ছাড়াও, লোকেরা আল্লাইন অঞ্চলে ঘুরে বেড়াতে, তাদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং প্রকৃতির কাছাকাছি যেতে পছন্দ করে।

সেপ্টেম্বর মাসে দর্শনীয় জিরো উপত্যকার এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

দুর্গাপূজা

দুর্গাপূজা বাঙালিদের জন্য একটি প্রধান উৎসব। দুর্গাপূজা সমগ্র বিশ্বের হিন্দু ধর্মালম্বিরা একই দিনে পালন করে থাকে। উৎসবটি হিন্দু ধর্মালম্বিদের হলেও ধীরে ধীরে সকল ধর্মের মানুষের মধ্যে এই উৎসব ঘিরে আনন্দের মিলন মেলা লক্ষ করা যায়। দেবী দুর্গার মূর্তি বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রকমের দেখা যায়। যা মনকে প্রশান্তি এনে দেয়। দেবীকে ঘিরে এই উৎসবের প্রতিটি দিনই বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও ধর্মীয় রীতিনীতি পালিত হয়। উৎসবটি উপলক্ষ্যে নতুন পোশাক পরিধান, স্বজনদের আপ্যায়নসহ অনেক বিষয় মানুষকে শিক্ষা দেয়।

পুরাণ অনুযায়ী বসন্তকাল হচ্ছে দুর্গা পুজোর সময়। কিন্তু রাবণকে বধ করার জন্য রামচন্দ্র দেবীর অকালে আবাহন করেন তাঁর আশীর্বাদ পাওয়ার জন্য। রাম যে দুর্গাকে পুজো করেছিলেন তাঁর দশটি হাত রয়েছে এবং তিনি মহিষাসুরকে বধ করেছিলেন। ১৫০০ শতকের শুরুতে সম্ভবত এই পুজোর সূচনা হয়েছিল। দিনাজপুর মালদার জমিদার প্রথম এই পুজো শুরু করেছিলেন বলে মনে করা হয়। তিনি দেবীর স্বপ্নাদেশ পেয়ে এই পুজো শুরু করেছিলেন পারিবারিকভাবে।

একটি লোকগাঁথা অনুযায়ী, বাংলার দুর্গাপুজোর সূচনা হয়েছিল তাহেরপুরের রাজা কংসনারায়ণ কিংবা নদীয়ার ভবানন্দ মজুমদারের হাত ধরে।

জন্মাষ্টমী

ভগবান কৃষ্ণের জন্মদিন, উত্তর ভারতে বিশিষ্টভাবে জন্মাষ্টমী হিসেবে পালিত হয়। যাই হোক, প্রধান উৎসব বৃন্দাবন এবং মথুরায় হয়। এখানে, মন্দিরগুলো লোকের ভিড়ে পূর্ণ থাকে। এই শুভ দিনে হিন্দুরা উপবাস করে এবং মন্দিরের পুরোহিত তার জন্মের সঠিক সময়ে কৃষ্ণ মূর্তিটি প্রকাশ করার জন্য অপেক্ষা করে। ভারতজুড়ে উৎসবটি খুব আনন্দের সাথে উদ্‌যাপিত হয়।

পিতৃপক্ষ মেলা

পিতৃপক্ষের মেলা বা পিত্রপক্ষ মেলা হলো একটি বার্ষিক অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে সারা দেশ থেকে মানুষ অংশগ্রহণ করে। এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পূর্বপুরুষদের পূজা করা হয়। মূলত এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পূর্বপুরুষদের পরিত্রাণ আনতে বিশ্বাস করা হয় এবং হিন্দু সংস্কৃতিতে এটি একটি বাধ্যতামূলক আচারও। এই অনুষ্ঠানে পবিত্র ডুব দেওয়া হয়। যারা বেঁচে নেই তাদের প্রিয়জনের প্রতি মানুষের ভালোবাসা প্রত্যক্ষ করা আশ্চর্যজনক। তারা গঙ্গা নদীর পবিত্র জলে ডুব দেওয়াসহ পরম ভক্তিসহ সমস্ত আচার পালন করে।

রাখি বন্ধন

ভাই ও বোনের চিরন্তন বন্ধনকে বিশ্বের মাঝে উজ্জ্বলভাবে ফুটে ওঠে রাখি বন্ধন উৎসবের মধ্য দিয়ে। এই উৎসবে, বোনেরা ভাইয়ের কব্জিতে একটি শুভ সুতো বেঁধে দেয় ভাইয়ের সুরক্ষার প্রতীক হিসেবে। যা ভাই তাকে দেয়। বিনিময়ে বোন তার ভাইয়ের কাছ থেকে বিভিন্ন ধরনের উপহার পায়। এই উৎসবে লোকেরা সুন্দর পোশাক পরে এবং নানান ধরনের মিষ্টি ভক্ষণ করে।

রামায়ণ অনুযায়ী, ভগবান রাম সমস্ত বানর সেনাদের ফুল দিয়ে রাখি বেঁধে ছিলেন। এছাড়া, লক্ষ্মী বলিকে ভাই হিসেবে মেনে রাখি পরিয়েছিলেন যাতে সে উপহার স্বরূপ বিষ্ণুকে স্বর্গে তার কাছে ফিরে যেতে বলে।

অন্যদিকে, সুভদ্রা কৃষ্ণের ছোট বোন, কৃষ্ণ সুভদ্রাকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। তবে আপন বোন না হয়েও দ্রৌপদী ছিলেন কৃষ্ণের অতীব স্নেহভাজন। একদিন সুভদ্রা কিছুটা অভিমান ভরে কৃষ্ণকে প্রশ্ন করেন, এর কারণ। উত্তরে কৃষ্ণ জানান, যথা সময়ে এর কারণ তুমি বুঝতে। এর কিছুদিন পর শ্রীকৃষ্ণের হাত কেটে রক্ত ঝরছিল, তা দেখে সুভদ্রা রক্ত বন্ধ করার জন্য কাপড় খুঁজছিলেন, কিন্তু কোথাও কোনো পাতলা সাধারণ কাপড় পাচ্ছিলেন না, এর মাঝে দ্রৌপদী সেখানে এসে দেখেন কৃষ্ণের হাত থেকে রক্ত পড়ছে। দেখামাত্রই বিন্দুমাত্র দেরি না করে নিজের মূল্যবান রেশম শাড়ি ছিঁড়ে কৃষ্ণের হাত বেধে দেন, কিছুক্ষণ পর রক্তপাত বন্ধ হয়। তখন শ্রীকৃষ্ণ বোন সুভদ্রাকে ডেকে বলেন–'এখন বুঝতে পেরেছ কেন

আমি দ্রৌপদীকে এত স্নেহ করি?'

রাখিবন্ধনের দিন গণেশের বোন গণেশের হাতে একটি রাখি বেঁধে দেন। এতে গণেশের দুই ছেলে শুভ ও লাভের হিংসে হয়। তাদের কোনো বোন ছিল না। তারা বাবার কাছে একটা বোনের বায়না ধরে। গণেশ তখন তাঁর দুই ছেলের সন্তোষ বিধানের জন্য দিব্য আগুন থেকে একটি কন্যার জন্ম দেন। এই দেবী হলেন গণেশের মেয়ে সন্তোষী মা। সন্তোষী মা শুভ ও লাভের হাতে রাখি বেঁধে দেন।

অন্য একটি কাহিনিতে, দৈত্যরাজা বলি ছিলেন বিষ্ণুর ভক্ত। বিষ্ণু বৈকুণ্ঠ ছেড়ে বালির রাজ্য রক্ষা করতে চলে এসেছিলেন। বিষ্ণুর স্ত্রী লক্ষ্মী স্বামীকে ফিরে পাওয়ার জন্য এক সাধারণ মেয়ের ছদ্মবেশে বলিরাজের কাছে আসেন। লক্ষ্মী বলিকে বলেন, তাঁর স্বামী নিরুদ্দেশ। যতদিন না স্বামী ফিরে আসেন, ততদিনের জন্য আশ্রয় প্রার্থনা করেন। বলিরাজা রাজি হন। শ্রাবণ পূর্ণিমা উৎসবে লক্ষ্মী বলিরাজার হাতে একটি রাখি বেঁধে দেন। বলিরাজা এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে লক্ষ্মী আত্মপরিচয় দিয়ে সব কথা খুলে বলেন। বলিরাজা মুগ্ধ হয়ে বিষ্ণুকে বৈকুণ্ঠে ফিরে যেতে অনুরোধ করেন। সেই থেকে শ্রাবণ পূর্ণিমা তিথিটি বোনেরা রাখিবন্ধন হিসেবে পালন করে।

প্রতিবছর শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমার দিন পালন করা হয়

সোলুং উৎসব

অরুণাচল প্রদেশের আদি উপজাতিরা পাঁচ দিন ধরে সোলুং উৎসব পালন করে। প্রতিটি দিন অনন্য উদ্‌যাপনের সাথে পালিত হয়। প্রথম দিন অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি; দ্বিতীয় দিন পশু জবাইয়ের জন্য, তৃতীয় দিনটি আচারের জন্য, চতুর্থ দিনটি গোলাবারুদ এবং অস্ত্র তৈরির জন্য এবং শেষ দিনটি উদ্‌যাপনের জন্য, যা বিদায় দিবস হিসেবে পরিচালিত হয়। এই উৎসবটি মূলত ফসলের উচ্চফলন এবং ক্ষতিকারক আত্মা থেকে সুরক্ষার জন্য স্রষ্টার কাছে প্রার্থনা হিসেবে পালিত হয়।

বড়দিন

যীশুখ্রিষ্টের জন্ম ভারতজুড়ে আনন্দময় উল্লাস এবং বিস্ময়কর আনন্দের সাথে উদ্‌যাপিত হয়। ভারতে খুব ঘটা করে বড়দিন পালন করেন খ্রিষ্টানরা। ক্রিসমাস ট্রি সাজায় আমগাছ ও কলাগাছ দিয়ে। অনেকে রঙিন তারা এবং ঝুলন্ত বল দিয়ে তাদের বাড়িতে ক্রিসমাস ট্রি সাজান। এই শুভ উৎসবে খ্রিষ্টের পবিত্র আশীর্বাদ পেতে লোকেরা চার্চেও যায়। এ দিনে দক্ষিণ ভারতে–তামিলনাড়ু, কেরালা, কর্ণাটক, অন্ধ্রপ্রদেশের খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের মানুষ ঘরে ছোট প্রদীপ জ্বালায়।

ঈদ-উল-ফিতর

ভারতের মুসলমানদের একটি প্রধান উৎসব ঈদু-উল-ফিতর। ঈদের নামাজ জনসমাবেশের সঙ্গে একটি খোলা জায়গায় যেমন মাঠ, কমিউনিটি সেন্টার বা মসজিদে আদায় করা হয়। নামাজের পরে মুসলিমরা তাঁদের আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব এবং পরিচিতদের সাথে দেখা করে বা বাড়িতে যায়, মৃত আত্মীয়-স্বজনের কবরে গিয়ে তাঁদের স্মরণ করেন। ধনী-গরিব সকলেই নতুন পোশাক পরিধান করে। সেমাইসহ বিভিন্ন মিষ্টিজাতীয় খাবার পরিবেশন করা হয়। উৎসবটি যদিও সারাবিশ্বের মুসলমানদের হলেও ধীরে ধীরে আনন্দটুকু সকলের হয়ে উঠেছে।

এই উৎসবের ইতিহাস সম্পর্কে জানা যায়, রাসুল (সা.) যখন মক্কা থেকে হিজরত করে মদিনায় গেলেন, তখন সেখানে জাহেলি যুগ থেকে প্রচলিত দুটি উৎসবের দিন ছিল; শরতের পূর্ণিমায় 'নওরোজ' এবং বসন্তের পূর্ণিমায় 'মেহেরজান'। রাসুল (সা.) জিজ্ঞাসা করলেন, এই দুই দিন কীসের? মদিনাবাসী সাহাবিরা বললেন, জাহেলি যুগ থেকে আমরা এই দুই দিন খেলাধুলা ও আনন্দ করি। রাসুল (সা.) বললেন, আল্লাহ এই দুই দিনের বদলে তোমাদের নতুন দুটি উৎসবের দিন দিয়েছেন : ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহা। (মুসনাদে আহমদ ১৩০৫৮)। এভাবে মুসলমানদের পৃথক উৎসবের সূচনা হলো। এটা দ্বিতীয় হিজরি অর্থাৎ ৬২৪ খ্রিষ্টাব্দের ঘটনা। রাসুল (সা.) ঘোষণা করলেন, 'সব জাতিরই ঈদ বা উৎসবের দিন থাকে, এটা আমাদের ঈদ।' (সহিহ বুখারি ৩৯৩১, সহিহ মুসলিম ২০৯৮)।

গণেশ চতুর্থী

উৎসবটি সমগ্র ভারতের অন্যান্য উদ্‌যাপনের মধ্যে সবচেয়ে বড়। উৎসবটি দশ দিনের। ভাদ্রপদ মাসের শুক্লপক্ষের চতুর্থী 'গণেশ চতুর্থী' বা 'গণেশ চৌথ' হিসেবে পালিত হয়। গণেশ চতুর্থী সারা ভারতে ব্যাপকভাবে পালিত হয়। যদিও এটি ভারতজুড়ে উদ্‌যাপিত হয়। তবে মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক এবং তেলেঙ্গানাতে ব্যাপকভাবে উদ্‌যাপিত হয়।

শিবরাত্রি

শিবরাত্রি ভগবান শিবকে উৎসর্গ করা একটি হিন্দু উৎসব। এই উৎসবে লোকেরা শিব মন্দিরে যায় এবং প্রার্থনা করে। সেই সাথে রাতভর শুভ স্তোত্র উচ্চারণ করে। কেউ কেউ সর্বশক্তিমানের প্রতি ভক্তিভরে অর্চনার জন্য দিনভর উপবাস করে। এই রাতে শিব মন্দিরে ভক্তরা জমায়েত হয় এবং মহান শিবের দীপ্তিময় আভায় উদ্ভাসিত হয়।

মহা শিবরাত্রি হিন্দু লুনি-সৌর ক্যালেন্ডারের ওপর ভিত্তি করে তিন বা দশ দিন ধরে পালিত হয়। প্রতি চান্দ্র মাসে একটি শিবরাত্রি হয়। ফাল্গুন মাসের ১৪তম দিনে অনুষ্ঠিত হয়। গ্রেগরীয় বর্ষপঞ্জিতে দিনটি ফেব্রুয়ারি বা মার্চ মাসে পড়ে।

হেমিস

এটি প্রতিবছর গুরু পদ্মসম্ভবের জন্মবার্ষিকীতে পালিত হয়। নৃত্য উৎসবটি বুদ্ধের পুনর্জন্মের কাহিনি প্রদর্শন করে ও বিশ্বখ্যাত। উৎসবটি সবচেয়ে আকর্ষণীয় অংশটি হলো মুখোশ নৃত্য। উৎসবটি ঐতিহ্যবাহী পোশাকে ঐতিহ্যবাহী নৃত্যসহ বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে হয়ে থাকে। যা সারা বিশ্বের পর্যটককে আকর্ষণ করে। লাদাখের মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্যে অনুষ্ঠানটি হয়ে থাকে। এটি দুই দিনের উৎসব।

লোধি

লোধি উত্তর ভারতের একটি ফসলের উৎসব। এটি একটি প্রাণবন্ত উৎসব। যা ভালোবাসার বন্ধন এবং সম্প্রীতির সাথে উদ্‌যাপিত হয়। উৎসবটি জানুয়ারি মাসে শীতকালীন ফসল উদ্‌যাপন করার উদ্দেশে হয়ে থাকে। এটি রাতে একটি উষ্ণ বনফায়ারের চারপাশে উপভোগ করা হয়, যেখানে লোকেরা পপকর্ন এবং চিনাবাদাম খায়, আগুনে ঝাঁকি দেয় এবং এই মহিমান্বিত উৎসবে একে অপরের প্রতি ভালোবাসা দেখায়।

এনাম রাজু ॥ কবি ও প্রাবন্ধিক

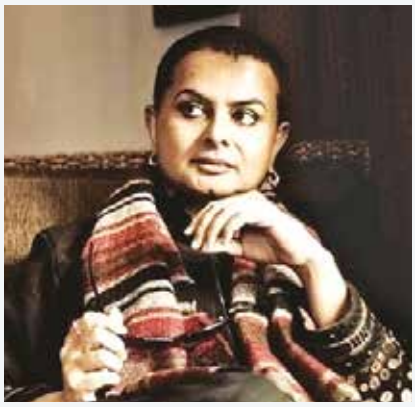

চিত্রাঙ্গদা

দুঃসাহসিক ইচ্ছেপূরণের ছবি

তাপস কুমার দত্ত

ঋতুপর্ণ ঘোষের 'শুভ মহরৎ' ছবিটি ২০০৩ সালে কলকাতায় প্রথমবার বড়পর্দায় দেখি। আগাথা ক্রিস্টির গল্প অবলম্বনে ঋতুপর্ণ ঘোষ কাহিনি সাজিয়েছিলেন ভারতের পটভূমিতে। সেটি ছিল একটি খুনের গল্প, প্রতিশোধের গল্প, দুঃসহ মানসিক টানাপড়েনের গল্প। এতটাই নিপুণ চিত্রনাট্য, কাব্যিক সংলাপ ও চিত্রায়ন এবং পরিচালনা ছিল যে, সেই প্রথম দেখা ছবিতেই আমি ঋতুপর্ণের প্রেমে পড়ে যাই। এরপর তার ছবি মুক্তি পেলে কখনো মিস করিনি। অতঃপর ২০১২ সালের সেপ্টেম্বরে 'চিত্রাঙ্গদা' ছবিটা দেখে রীতিমতো চমকে যাই। দুঃসাহসিক তো বটেই, রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা' নৃত্যনাট্যের ওপর ভর করে এই ছবি এমন সব ট্যাবু ভেঙেচুরে দিয়েছে, যার তুলনা বাংলা চলচ্চিত্রে দ্বিতীয়টি নেই। অনেকের মতে 'চিত্রাঙ্গদা' ঋতুপর্ণের শ্রেষ্ঠ ছবি। কিন্তু কেন?

'চিত্রাঙ্গদা'য় যা দেখানো হয়েছে, যা বলা হয়েছে, যা বলা হয়নি কিন্তু বোঝানো হয়েছে–তা ঋতুপর্ণ ঘোষ বলেই সম্ভব হয়েছে। অনেকেই মনে করেন, এ যে তাঁর আত্মজৈবনিক ভাবনা-রস জারিত ছবি। ছবিটি মুক্তি পায় ২০১২ সালের ৩১ আগস্ট, দিনটি ছিল ঋতুপর্ণের জন্মদিন। দিনটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ এটাই ছিল ঋতুপর্ণের জীবদ্দশায় শেষ জন্মদিন। ২০১৩ সালের ৩০ মে ঋতুপর্ণের জীবনাবসান ঘটে, মাত্র ৪৯ বছর বয়সে। ৪৯-এ ১৯টি ছবি। প্রতিটিই ছবি অনবদ্য, এর মধ্যে ১২টি ছবিই ভারতের জাতীয় পুরস্কার ভূষিত হয়েছে। 'চিত্রাঙ্গদা'ও পেয়েছে বিশেষ জুরিবোর্ড পুরস্কার। কিন্তু সেটা বাহ্যিক। ভিতরে ভিতরে 'চিত্রাঙ্গদা' ট্যাবু ভাঙার হাতিয়ার, ভারতীয় ছবির এক বিরাট বড় উল্লম্ফন। ব্যাপারটা বুঝতে আমাদের ফিরতে হবে রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা'য়। এই নৃত্যনাট্যের মূল গল্পটি হলো–মণিপুর রাজবংশে শিবের আশীর্বাদে শুধু ছেলে হয়, কিন্তু একবার 'চিত্রাঙ্গদা' নামে এক নারী জন্মাল। কিন্তু বাবা তাকে নারী হিসেবে মানেনি। সেজন্য চিত্রাঙ্গদাকে পুরুষ হিসেবে বড় করে তোলে। তাকে শিকার, যুদ্ধবিদ্যা, রাজ্যশাসন শেখায়। তারপর একদিন অর্জুনকে দেখে মুগ্ধ হয়ে রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদা কামদেব মদনের কাছে বর চাইলেন। এবার সে হতে চায় ললিত নারী, অর্জুনের প্রেয়সী।

এই কাহিনির দুটো মেটাফোর ঋতুপর্ণ তাঁর 'চিত্রাঙ্গদা' ছবিতে তুলে ধরেছেন। ঋতুপর্ণ নিজে এই ছবিতে অভিনয় করেছেন একজন কোরিওগ্রাফারের চরিত্রে, রুদ্র যার নাম। রুদ্ধর গ্রুপ রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা' মঞ্চায়িত করছে। সেই দলে ড্রাম বাদক হিসেবে যুক্ত হন পার্থ (যীশু অভিনয় করেন এই চরিত্রে)। আমাদের মনে রাখতে হবে অর্জুনের আরেক নাম পার্থ। সুতরাং মঞ্চে একদিকে চিত্রায়িত হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা', অন্যদিকে রুদ্র (কাহিনির প্রতীকী চিত্রাঙ্গদা, যিনি পুরুষ থেকে নারী হতে চান) প্রেমে পড়ছেন পার্থর। এজন্য ছবির 'টাইটল কার্ড'-এর শুরুতেই জানিয়ে দেওয়া হয়–চিত্রাঙ্গদা আসলে একটি ইচ্ছের গল্প। বাবার ইচ্ছে বনাম চিত্রাঙ্গদার ইচ্ছে। এটিই এই ছবির নির্যাস। ছবি যত এগোয়, বোঝা যায়, রুদ্রর বাবা (দীপঙ্কর দে) তাঁর ছেলের মেয়েলি ভাব, নাচ করা পছন্দ করেন না। তবু রুদ্র তার প্রেমিক পার্থকে (যীশু) ভালোবেসে শরীরের রূপান্তর ঘটাতে চান, মেয়ে হয়ে উঠতে চান। এবং সেই 'ইচ্ছেটাকে' সত্যি করতে ছেলে থেকে মেয়ে হওয়ার জন্য অপারেশন টেবিলে প্রবেশ করেন রুদ্ধরূপী ঋতুপর্ণ। অপারেশন যখন শুরু হয় তখন ব্যাকগ্রাউন্ডে বাজতে থাকে–'বঁধু, কোন আলো লাগলো চোখে।' বঁধু (বন্ধু) পার্থকে ফোন করা হয় শেষবারের মতো কথা বলতে চায় রুদ্ধ। কিন্তু পার্থ তখন কোনো এক দূরাগত ট্রেনে। আর ট্রেনটি তখন সুড়ঙ্গের মধ্যে, নেটওয়ার্কের বাইরে।

একের পর এক প্রতীকী দৃশ্য, চিন্তাউদ্রেককারী সংলাপের অপূর্ব অর্কেস্ট্রা এই ছবি। যেমন সাইকিয়াট্রিস্ট শুভকে (অঞ্জন দত্ত) রুদ্র পুরীর সমুদ্র সৈকতে বসে বলছে–'হোয়াই ইজ এ বিল্ডিং কলড এ বিল্ডিং ইভেন আফটার ইট ইজ কমপ্লিট?' বিল্ডিং মানে তো দ্য আকশন অব কনস্ট্রাক্টিং সামথিং। অর্থাৎ কোনো কিছু নির্মাণের চলমান প্রক্রিয়া। তাহলে যেই নির্মাণ 'সম্পূর্ণ' হয়ে গেছে, সেটাকেও কেন 'বিল্ডিং' বলা হয়? এই প্রশ্নের উত্তরে শুভ (অঞ্জন) বলেন, 'বিকজ নো ট্রানজিশন ইজ এভার কমপ্লিট। ইটস অ্যান অনগোয়িং প্রসেস।' কোনো রূপান্তরই কখনো সম্পূর্ণ হয় না, এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া। হাসপাতালে রুদ্রকে সেবিকা কী বলে ডাকবেন–স্যার নাকি ম্যাম? রুদ্ধর স্পষ্ট উত্তর–কল মি রুদ্ধ। জেন্ডার কোনো মানুষের পরিচয় হতে পারে না। তার নামটাই তার আইডেন্টিটি।

'হীরের আংটি' দিয়ে চলচ্চিত্র-যাত্রা শুরু হয়েছিল ঋতুপর্ণের। শেষ হয় চিত্রাঙ্গদায়। অসম্পূর্ণ থাকে তাঁর ব্যোমকেশ বক্সী–সত্যান্বেষী। এর মাঝে কাব্যিক চিত্রায়নে উপহার দিয়েছেন উনিশে এপ্রিল, দহন, উৎসব, চোখের বালি, দোসর, রেনকোট, শুভ মহরৎ, সব চরিত্র কাল্পনিক, নৌকাডুবি আবহমানের মতো অপূর্ব সব ছবি। বর্ণিল কাব্যিক ঋতু কেবল ইচ্ছাপূরণের গল্প বলে যাননি, সেটা করেও দেখিয়েছেন।

তাপস কুমার দত্ত ॥ কথাসাহিত্যিক, চলচ্চিত্রকার

সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ

ভারত বিচিত্রা

লেখা পাঠানোর নির্দেশনাবলি

ভারত বিচিত্রায় ভ্রমণকাহিনি, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, গল্প, কবিতা, উপন্যাস প্রভৃতি লিখে পাঠাতে পারেন। লেখার সঙ্গে লেখকের নাম, ব্যাংক একাউন্ট নাম, একাউন্ট নম্বর, ব্যাংকের নাম, ব্রাঞ্চের নাম ও রাউটিং নম্বর অবশ্যই উল্লেখ থাকতে হবে। লেখার কপি রেখে নির্ভুল ঠিকানা, ফোন নম্বর ও ই-মেইলসহ আমাদের কাছে পাঠান। অমনোনীত লেখা ফেরত পাঠানো হয় না। লেখা অবশ্যই এমএস ওয়ার্ড (SutonnyMJ)-তে কম্পোজ করে দিতে হবে। সঙ্গে চেকবইয়ের ভেতরের পাতার ছবি তুলে বা স্ক্যান করে দেওয়ার অনুরোধ রইল। তথ্যসমূহ ইংরেজিতে পূরণ করে ডাকযোগে বা ই-মেইলে পাঠান। অন্যথায় লেখা মনোনীত হলেও আমরা ছাপাতে পারব না। – সম্পাদক

ভারতীয় হাই কমিশন প্লট ১-৩, পার্ক রোড, বারিধারা, ঢাকা-১২১২। ই-মেইল: inf2.dhaka@mea.gov.in

Name :..... Pen Name :.....

Address :..... Bank Account Name :.....

..... Account No :.....

..... Bank Name :.....

Phone/Mobile :..... Branch Name :.....

e-mail :..... Routing No :.....

মাননীয় হাই কমিশনার প্রণয় ভার্মা ১৪ মে ২০২৩-এ দশটি বাংলাদেশি স্টার্ট-আপ প্রতিষ্ঠানের একটি দলের সঙ্গে পারস্পারিক অধিবেশন পর্ব পরিচালনা করেন।

মাননীয় বিদেশমন্ত্রী ড. এস জয়শঙ্কর ১২ মে ২০২৩-এ ঢাকায় অনুষ্ঠিত ৬ষ্ঠ ভারত মহাসাগরীয় সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশনে মূল বক্তব্য প্রদান করেন।

ভারত-বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (আইবিসিসিআই) মাননীয় হাই কমিশনার শ্রী প্রণয় ভার্মা ও বাংলাদেশের মাননীয় শিল্পমন্ত্রী জনাব নুরুল মজিদ হুমায়ুনকে ০৮ মে ২০২৩-এ ঢাকায় এফবিসিসিআই আয়োজিত 'ইনভেস্টমেন্ট অপরচুনিটিজ বিটুয়িন নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়া অ্যান্ড বাংলাদেশ' শীর্ষক একটি সেমিনারে যোগদান করেন।

ভারতের মাননীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শ্রী নিত্যানন্দ রাই ৪ মে ২০২৩-এ বাংলাদেশের সিলেট জেলার তামাবিল সীমান্তবর্তী মেঘালয়ের ডাউকিতে একটি নতুন আধুনিক সমন্বিত চেকপোস্ট উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় হাই কমিশনার প্রণয় ভার্মা। এই অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন মেঘালয়ের উপ-মুখ্যমন্ত্রী শ্রী স্নিয়াভলাং ধর, ল্যান্ড পোর্ট অথরিটি অব ইন্ডিয়ার চেয়ারম্যান শ্রী আদিত্য মিশ্র ও বাংলাদেশ ল্যান্ডপোর্ট অথরিটির চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আলমগীর।

মাননীয় হাই কমিশনার প্রণয় ভার্মাকে ০২ মে ২০২৩-এ ঢাকায় ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে মাল্টিমোডাল কানেক্টিভিটির ওপর উন্নয়ন সমন্বয় কর্তৃক আয়োজিত একটি সেমিনারে মূল বক্তব্য প্রদান করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর প্রফেসর ড. আতিউর রহমানের আয়োজনে ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক ড. দেলাওয়ার হোসেনের সভাপতিত্বে সেমিনারটি অনুষ্ঠিত হয়।

মাননীয় হাই কমিশনার প্রণয় ভার্মা ২ মে ২০২৩ ঢাকায় রাষ্ট্রপতির সরকারি বাসভবন বঙ্গভবনে বাংলাদেশের নতুন মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিনের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

Regd. No. DA 355, Bharat Bichitra, May, 2023

ভারতীয় হাই কমিশন লাইব্রেরি, ঢাকা

ইন্দিরা গান্ধী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র এবং লাইব্রেরি
হাউজ নং : ২৪, রোড নং : ০২, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ
টেলিফোন : +৮৮০২৯৬১২৩২২, ইমেইল : lib.dhaka@mea.gov.in

লাইব্রেরি সময় : রবিবার থেকে বৃহস্পতিবার ॥ সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৫.৩০ মিনিট

লাইব্রেরি মেম্বারশিপ ফরম : www.hcidhaka.gov.in/pdf/membershipapplicationform-292018.pdf

ভারতীয় ভিসা আবেদনকারীদের জন্য জ্ঞাতব্য

ভারতীয় হাই কমিশন ও ভিসা আবেদন কেন্দ্রের সঙ্গে কোনো এজেন্টের সম্পর্ক নেই।
ভারতীয় হাই কমিশন বাংলাদেশি নাগরিকদের কাছ থেকে কোনো ভিসা ফি নেয় না।
ভিসা আবেদন কেন্দ্র ভিসা প্রসেসিং ফি হিসেবে মাত্র ৮০০ টাকা নিয়ে থাকে।

আবেদন করার আগে দয়া করে এই তথ্যগুলো সম্পর্কে সচেতন হোন।